ডিএলএস স্টাফদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ মডিউল

Training Module

DLS Staffs Training on Professional Development

প্রশিক্ষণ মেয়াদ: ৫ দিন

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ)

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়।

ডিএলএস স্টাফদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন এর উপর

প্রশিক্ষণ মডিউল

পান্ডুলিপি প্রণয়ন

ডা. মোঃ জহিরুল ইসলাম

সম্পাদনায়

ড. মোঃ গোলাম রব্বানী

ড. এবিএম মুস্তানুর রহমান

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মোঃ আব্দুর রহিম

প্রকল্প পরিচালক

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)

উপদেষ্টা

ডা. আবদুল জব্বার শিকদার

মহাপরিচালক

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়

ওয়াল্ড ব্যাংক

পরামর্শ ও মতামত প্রদান

ডা. মোহাম্মদ সালেহ উদ্দিন খান

কল্যাণ কুমার ফৌজদার

ড. জীবন চন্দ্র দাস

প্রকাশনায়

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

''বাণী''

ত্রিশ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশকে সুখী, সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁর সুযোগ্য উত্তরসুরী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বৃহত্তর কৃষি সেক্টরে গ্রহণ করা হচ্ছে আধুনিক লাগসই প্রযুক্তিভিত্তিক নতুন নতুন প্রকল্প। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক ইচ্ছায় প্রাণিসম্পদ সেক্টর উন্নয়নে বিশ্ব ব্যাংক ও সরকারের যৌথ অর্থায়নে গ্রহণ করা হয়েছে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)।

বর্তমানে জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ প্রত্যক্ষ এবং প্রায় ৫০ শতাংশ পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদের উপর নির্ভরশীল। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ সেক্টরের টেকসই উন্নয়ন, তৃণমূল পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ খাতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি, প্রাণিজ আমিষ, দুধ, ডিম ও মাংসের চাহিদা পূরণ হবে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার ''আমার গ্রাম, আমার শহর'' বাস্তবায়নে ২০১৯-২০২৩ সালের মধ্যে প্রাণিসম্পদ খাতের এই আমূল পরিবর্তনে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। বর্তমানে তৃণমূল খামারী, উদ্যোক্তা এবং স্টেকহোল্ডারগণ প্রাণিসম্পদ সেক্টর থেকে পরামর্শ ও বিভিন্ন ধরণের বিষয়ভিত্তিক সেবা গ্রহণ করছে। প্রাণিজ আমিষের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, এসডিজি ২০৩০ এর অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সচেষ্ট রয়েছে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাব-টেকনিক্যাল ষ্টাফদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন, আধুনিক প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিতি, রোগনিয়ন্ত্রণ ও টেকসই উন্নয়ন, সর্বোপরি প্রাণিসম্পদ খাতে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। উল্লেখিত ষ্টাফদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী উভয়ের জন্য দিকনির্দেশনামূলক একটি মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি আশাকরি, মডিউলটি সংশ্লিষ্টদের কার্যকর প্রশিক্ষণের মাধ্যমের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সূচারুরূপে পরিচালনায় মডিউলটি সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাব- টেকনিক্যাল ষ্টাফগণ নিজেদেরকে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে তুলবেন। ফলে তারা পেশাগত দিক থেকে দক্ষ হওয়ার পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায়ে খামারীদের সেবা প্রদান এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। যুগোপযোগী এ মডিউলটি রচনা, সম্পাদনা ও প্রকাশনায় যারা মেধা, মনন ও শ্রম দিয়েছেন তাদের সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আল্লাহ হাফেজ।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

শ.ম. রেজাউলকরিম, এমপি

সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

‘‘বাণী’’

গাঙ্গেয় পললভূমিতে গড়ে ওঠা আমাদের দেশ প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলানিকেতন। ইতিহাসের নানা ধাপ পেরিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আজ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃত ও সম্মানের আসনে অভিষিক্ত। জাতিসংঘ ঘোষিত এমডিজির সফল বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অপরীসিম সক্ষমতা ও সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন ও এর ধারাবাহিকতায় ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদা লাভ এবং সর্বোপরি ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকারের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের প্রতি সরকার সমধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট স্থাপনের মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের অপার সম্ভাবনাময় দ্বার উন্মোচনের পাশাপাশি পদ্মা বহুমুখী সেতু, ঢাকা মাস র‍্যাপিড ট্র্যানজিট (মেট্রোরেল) বাস্তবায়নের মাধ্যমে অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যাপক অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বিগত দশকে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। দেশের ক্রমবর্ধমান প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির টেকসইজাত উন্নয়ন এবং রোগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় ‘‘প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প’’ গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে প্রাণিসম্পদ খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রডিউসার অর্গানাইজেশন গঠন, মার্কেট লিংকেজ গড়ে তোলা এবং ভ্যালুচেইনের উন্নয়নে টেকসই বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করা। এ সকল কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও গবেষণার উপর সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি প্রদর্শনীর মাধ্যমে খামারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, দুগ্ধ বিপণনের জন্য বাজার সংযোগ, পণ্য বহুমুখীকরণ, মূল্য সংযোজন, স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রকল্পটির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় ইমারজেন্সি এ্যাকশন প্ল্যানের আওতায় ডেইরি এবং পোল্ট্রি সেক্টরে মোট ৬ লক্ষ ২০ হাজার উপকারভোগী খামারি নির্বাচন পূর্বক নির্বাচিত খামারিগণকে প্রণোদনা প্রদান করা হবে।

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নে মাঠপর্যায়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্প এলাকায় সম্প্রসারণ সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য অধিদপ্তরের সাব-টেকনিক্যাল ষ্টাফদের দক্ষতা উন্নয়নে দিক নির্দেশনামূলক যুগোপযোগী একটি প্রশিক্ষণ সহায়ক মডিউল তৈরি করা হয়েছে, যা প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে ফলপ্রসূ হবে। আমি আশাকরি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাব-টেকনিক্যাল ষ্টাফদের জন্য প্রণীত বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ গাইড হিসেবে মডিউলটি কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এ মডিউল রচনা, সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আল্লাহ হাফেজ।

বাংলাদেশ চিরজীবি হোক

রওনক মাহমুদ

মহাপরিচালক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

"বাণী"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। আমাদের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে অপার সম্ভাবনাময় প্রাণিসম্পদ খাতের সার্বিক উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও প্রযুক্তিভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। পুষ্টি নিরাপত্তা, দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ খাতের গুরুত্ব অপরিসীম।

মেধাবী ও বুদ্ধিদীপ্ত জাতি গঠনে প্রাণিজ আমিষের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ভিশন ২০২১ এ দেশের শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষের জন্য পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবারের নিশ্চয়তার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। মাথাপিছু দৈনিক ২৫০ মি.লি. দুধ, ১২০ গ্রাম মাংস ও সপ্তাহে দুইটি করে ডিম সরবরাহের হিসাবে বাৎসরিক দুধ, মাংস ও ডিমের মোট চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ১০ বছরে দুধের প্রাপ্যতা বেড়েছে প্রায় ৪ গুণ। দেশের মানুষের প্রয়োজনীয় প্রাণীজ আমিষ ও পুষ্টিকর খাদ্যের ঘাটতি এখন ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এ ঘাটতি শূন্যের কোটায় আনয়নের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) গ্রহণ করেছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ে কর্মরত উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (প্রাণিস্বাস্থ্য, সম্প্রসারণ, কৃত্রিম প্রজনন) এবং অত্র প্রকল্পে কর্মরত লাইভস্টক ফিল্ড এসিস্টেন্ট (এলএফএ) দের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ৫দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সূচারুরূপে বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রণীত এ মডিউলটি সংশ্লিষ্টদের বিষয়ভিত্তিক ও জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

মডিউলটি রচনা, সম্পাদনা এবং প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশাকরি, এ মডিউলটি সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্পের লক্ষ্য বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হবে।

আল্লাহ্ হাফেজ

বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

ডা. আবদুল জব্বার শিকদার

প্রকল্প পরিচালক
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

‘‘মুখবন্ধ’’

উন্নত জাতি গঠনের প্রধান নিয়ামক শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি। আর দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়ার আশৈশব লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরন্তর আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত জাতির মর্যাদা লাভ এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার কর্মযজ্ঞে সার্বক্ষণিক আত্মনিয়োজিত রয়েছেন। দক্ষ জনশক্তি সৃজনের প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাই অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ইতোমধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত এমডিজি এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে বিপুল প্রশংসিত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় এসডিজি-২০৩০ যথাযথভাবে বাস্তবায়নে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রাণিসম্পদ সভ্যতা-সংস্কৃতির বুনিয়াদ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মানুষের প্রথম বাহন কুকুর থেকে শুরু করে দ্রুত গতির অশ্ব মানুষের সহজাত সচলতায় অধিকতর গতি সঞ্চার করেছে। পশুপালন যুগে মানুষের খাদ্যেও প্রধান উৎস ছিল প্রাণি জগৎ। কৃষি সভ্যতা বিকশিত হয়েছে প্রাণি শক্তির বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারের মাধ্যমে। শিল্পবিপ্লবের যুগে আধুনিক মানুষ সুষম খাদ্যের তালিকা প্রণয়নে প্রাণিজাত খাদ্যকে সমধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। মানবজাতির ইতিহাসে প্রাণিতাই গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। খাদ্যচক্রে প্রাণি ও উদ্ভিদের যেমন পারস্পরিক নির্ভরতা রয়েছে, তেমনি মানব জীবন প্রতি পদে খাদ্যচক্রের এই বৃত্তবর্তী। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প” তাই দেশের প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

বর্তমানে তথ্য-উপাত্ত সক্ষমতার সমার্থক হিসেবে গণ্য। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (প্রাণিস্বাস্থ্য, সম্প্রসারণ, কৃত্রিম প্রজনন) এবং এ প্রকল্পে কর্মরত লাইভস্টক ফিল্ড এসিস্টেন্ট (এলএফএ) দের প্রাণি সম্পদের তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা, খামারিদের প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে পরামর্শ প্রদান ও উন্নততর প্রযুক্তির সাথে পরিচয়ের সূত্রধন হিসেবে কাজ করেছে। সম্প্রসারণ কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি একই সূত্রে গাঁথা। নিয়মিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ সংশ্লিষ্টদের অধিকতর দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে তুলবে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়নের উপর তাই সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রকল্পের ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচী যেন প্রশিক্ষকগণকে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পাঠদান এবং প্রশিক্ষণার্থীগণকে কার্যকর পাঠ গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। উপ-প্রকল্প পরিচালক ডাঃ মোঃ জহিরুল ইসলাম যে একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রণয়নে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং এ কাজটি সম্পাদনে প্রকল্পের আরও যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী সহায়তা করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আল্লাহ্ হাফেজ

বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

মো: আব্দুর রহিম

প্রশিক্ষণ নোট ঃ

ডিএলএস স্টাফ প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সাব টেকনিক্যাল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক একটি মডিউলভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স হিসেবে বিবেচিত হবে। গুরুত্ব ও প্রয়োজন অনুসারে মডিউলটিতে ২৫টি সেশন সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কোর্সটি-কে আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রতিদিন সকাল ৯.০০ টায় শুরু হবে এবং দুপুর ১.০০-২.০০ পর্যন্ত বিরতিসহ বিকেল ৫.০০ পর্যন্ত চলমান থাকবে। প্রশিক্ষণ ক্লাশসমুহ সিডিউল মোতাবেক যথাসময়ে শুরু ও শেষ করা হবে। মডিউলের বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণ সুচী প্রনয়ণ করা হবে। প্রতিটি সেশনের জন্য একজন করে বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষক/রিসোর্স পারসন থাকবেন। তিনি তাঁর বিষয়বস্তু মালটিমিডিয়ার মাধ্যমে ক্লাসে উপস্থাপন ও আলোচনা করবেন। প্রশিক্ষণ শুরুর পূর্বে প্রশিক্ষণ সহযোগী প্রশিক্ষণ সামগ্রী (খাতা, কলম, নোট, লেকচার শীট, মডিউল ইত্যাদি) প্রশিক্ষনার্থীদের হাতে পৌঁছে দিবেন।

প্রশিক্ষক/রিসোর্স পারসন এর জন্য করণীয় ঃ

১. প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিস্কার ও স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে কথা বলুন। যাতে সবাই শুনতে ও বুঝতে পারে।
২. ভিজ্যুয়াল এইড মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, পয়েন্টার ব্যবহার করুন।
৩. প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের কম্পিউটার ব্যবহারের জ্ঞান সম্পর্কে জেনে নিন।
৪. আপনার উপস্থাপিত বিষয় কম্পিউটারে খুলুন এবং মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরে প্রদর্শন করুন।
৫. বিষয়ের উপর নির্ধারিত মুক্ত আলোচনায় প্রশিক্ষনার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন।
৬. ব্যবহারিক ক্লাশের বিষয়বস্তু অনুযায়ী উপকরণ সংগ্রহ/সংগৃহিত উপকরণ দিয়ে হাতে কলমে ব্যবহারিক শিক্ষা দিন।
৭. প্রশিক্ষনার্থীদের পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে কোন মতামত থাকলে তা লিপিবদ্ধ করুন এবং প্রশিক্ষণ সমন্বকারী/প্রকল্পের ট্রেনিং উইং-কে অবহিত করুন।

প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্য ঃ

১. প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কলাকৌশলের সাথে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সাব টেকনিক্যাল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিচিত ও দক্ষতা উন্নয়ন করা।
২. আধুনিক পদ্ধতিতে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে তাত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে প্রক্ষিনার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
৩. গবাদিপশু পালন ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক বিষয়ে ছবি ও চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতির সাথে প্রশিক্ষণার্থীদের পরিচিত ও দক্ষতা উন্নয়ন করা।
৪. আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিগ্রহন ও ব্যবহারে কৃষকদের সহজে উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
৫. এলডিডিপি'র বাস্তবায়ন কৌশল ও ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে সাব টেকনিক্যাল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিচিতি ও সম্পৃক্তকরন।
৬. প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাব টেকনিক্যাল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আধুনিক প্রযুক্তি সর্ম্পকে ধারনা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করা।

প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রত্যাশা ঃ

প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা-

১. অতি সহজে আধুনিক পদ্ধতিতে গবাদিপশু ও হাঁস মুরগি পালনের কলাকৌশল ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞানলাভে সক্ষম হবেন।
২. কৃষক পর্যায়ে গবাদিপশু ও হাঁস মুরগি পালনের সমস্যা চিহ্নিতকরণে ও সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবেন।
৩. কৃষক পর্যায়ে গবাদিপশু ও হাসঁ-মুরগী পালনে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
৪. আধুনিক পদ্ধতিতে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে কৃষকদের সার্বিক সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদানে সক্ষম হবেন।
৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে আধুনিক পদ্ধতিতে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী লালন পালন বিষয়ে দক্ষ হবেন।

সূচিপত্র

দিন	সেশন	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১ম	১	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তার ব্যাবহার	৯
	২	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভিশন ও মিশন, কার্যপরিধি, বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা SDG ও SDG বাস্তবায়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কার্যক্রম	১২
	৩	প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) এর পরিচিতি প্রকল্প বাস্তবায়নে উপসহকারী প্রাণিসম্পদ অফিসার এবং ফিল্ড এসিস্টেন্ট এর দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৫
	৪	মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সংগঠন ব্যবস্থাপনা	১৯
	৫	প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কৌশল	২২
২য়	৬	কৃষক মাঠ স্কুল, কৃষক মাঠ দিবস ও কৃষক সমাবেশ	২৭
	৭	অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা (PRA) পদ্ধতির ব্যবহার	৩০
	৮	গবাদিপশুর সুষম রেশন তৈরি ও গাভীর খাদ্য ব্যবস্থাপনা	৩৪
	৯	সবুজ ঘাস সংরক্ষণে সাইলেজ তৈরী ও ব্যবহার	৩৮
	১০	গো-খাদ্য হিসেবে হাইড্রোপনিক ঘাস চাষ প্রযুক্তি	৪১
৩য়	১১	গো-খাদ্য হিসেবে এ্যালজি উৎপাদন ও ব্যবহার	৪৩
	১২	গো-খাদ্য হিসেবে কলা গাছ সংরক্ষন ও ব্যবহার	৪৫
	১৩	গবাদিপশুর ব্রিডিং পদ্ধতি এবং বাংলাদেশে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন কার্যক্রম	৪৭
	১৪	গাভীর দুধ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ডেইরি ভ্যালু চেইন উন্নয়ন	৫১
	১৫	গগবাদিপশুর খামারে প্রাণি সনাক্তকরণ পদ্ধতি এবং রেকর্ড সংরক্ষণ	৫৭
৪র্থ	১৬	গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রযুক্তি এবং গো খাদ্য হিসেবে ইউএমএস তৈরী ও ব্যবহার	৬২
	১৭	বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ও ভেড়া পালন পদ্ধতি	৬৭
	১৮	সোনালী লেয়ার মুরগী পালন পদ্ধতি	৭৪
	১৯	বানিজ্যিক টার্কি পালন প্রযুক্তি	৭৯
	২০	জুনোটিক রোগের পরিচিতি, কারন ও প্রতিরোধ	৮৪
৫ম	২১	অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (AMR) ও তার প্রতিরোধ	৮৭
	২২	কমিউনিটি এনিমেল হেলথ ম্যানেজমেন্ট এবং মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক	৮৯
	২৩	প্রতিষেধক টিকার গুণগতমান রক্ষায় কুল চেইন ব্যবস্থাপনা	৯১
	২৪	খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ঃ বায়োগ্যাস, বায়োকম্পোষ্ট তৈরী ও ব্যবহার	৯৫
	২৫	‘স্মার্ট লাইভষ্টক ভিলেজ’ আইডিয়া	৯৮
বিবিধ	১	প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারীদের তথ্য ফরমের নমুণা ছক	১০৬
	২	প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত ও পর্যলোচনা ছক	১০৭
	৩	পরিভাষা (Terminology)	১০৮
	৪	আদ্যাক্ষর ও পূর্ণ অর্থ (Acronyms)	১১০
	৫	রেফারেন্স সমূহ (References)	১১১

সেশন-১

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তার ব্যাবহার

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- শুদ্ধাচারের ধারণা
- শুদ্ধাচারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত আইনকানুন ও নিয়মনীতি
- শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়নের যৌক্তিকতা
- শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় করনীয়
- শুদ্ধাচারী কর্মচারীর গুনাবলী

শুদ্ধাচারের ধারণা ঃ

শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়। এর দ্বারা একটি সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদন্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝানো হয়। ব্যক্তিপর্যায়ে এর অর্থ হল কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা, তথা চরিত্রনিষ্ঠা। এই দলিলটিতেও শুদ্ধাচারের এই অর্থকেই গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যক্তির সমষ্টিতেই প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয় এবং তাদের সম্মিলিত লক্ষ্যই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রতিফলিত হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচার অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; সমন্বিত রুপ হিসাবে প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার অনুশীলনও জরুরি। রাষ্ট্রীয় আইনকানুন ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি ও দর্শন এমনভাবে প্রণীত ও অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন যাতে এগুলি শুদ্ধাচারী জীবন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়। বাংলাদেশের সমাজ বিভিন্ন খাত, যথা রাষ্ট্র, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজে বিভিন্ন আইনকানুন, নিয়মনীতি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পালন ও লালন করে শুদ্ধাচার অনুশীলন করে চলেছে এবং সময়ের চাহিদা অনুযায়ী তাতে সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন করছে।

শুদ্ধাচারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত আইনকানুন ও নিয়মনীতি ঃ

ক) বাংলাদেশের সংবিধানের চেতনা নির্দেশ করে যে, বাংলাদেশ হবে একটি ন্যায়ভিত্তিক, শুদ্ধাচারী সমাজ, এর নাগরিকবৃন্দ, পরিবার, রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজও হবে দুর্নীতিমুক্ত ও শুদ্ধাচারী। ব্যক্তিমানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা ও অধিকার সংরক্ষণ এবং সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রের আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রণীত হয়েছে এবং অনুসৃত হচ্ছে। রাষ্ট্র ও সমাজে কার্যকরভাবে ন্যায় ও সততা প্রতিষ্ঠা এবং সফলতার সঙ্গে দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা সরকারের একটি মূল নীতি।

খ) যে কোনও ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ কিংবা সুযোগ ব্যবহারের উদ্যোগে দুর্নীতি সংঘটিত হতে পারে। সেজন্য দুর্নীতি প্রতিরোধের বিধান সুদূর অতীত থেকেই চালু রয়েছে। ১৮৬০ সালের Penal code- এ দুর্নীতি প্রতিরোধের বিধান রয়েছে। ১৯৪৭ সালে দুর্নীতি দমন আইন পাশ হয়। ২০০৪ সালের ৫ নম্বর আইনে 'দেশে দুর্নীতি ও দুর্নীতিমূলক কার্য প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুর্নীতি ও অন্যান্য সুনির্দিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনার জন্য একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান' প্রণীত হয়। এই আইনের আওতায় যেসব কার্য অপরাধ বলে বিবেচিত হয় তা হল: ' খ) The Prevention of corruption Act, 1947 (Act 11 of 1947)- এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ; (গ) The penal code 1860 (Act XLV of 1860)-এর section 161-169,217,218,408,409 and 477A-এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধসমূহ;' এবং এসব অপরাধের সঙ্গে সংযুক্ত সহায়তাকারী ও ষড়যন্ত্রমূলক ও প্রচেষ্টামূলক অপরাধকার্য। সম্প্রতি প্রণীত 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২'-এর আওতাধীন অপরাধও দুর্নীতি হিসাবে বিবেচিত।

সহজ বর্ণনায় এসব অপরাধ হল সরকারি কর্মচারীদের বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত অন্যবিধ বকশিস গ্রহণ; সরকারি কর্মচারীদের অসাধু উপায়ে প্রভাবিত করার জন্য বকশিস গ্রহণ; সরকারি কর্মচারী কর্তৃক বিনামূল্যে মূল্যবান বস্তু গ্রহণ; কোন মানুষের ক্ষতি সাধনার্থে সরকারি কর্মচারীদের আইন অমান্যকরণ; সরকারি কর্মচারীদের বেআইনি ব্যবসা পরিচালনা; কাউকে সুবিধা প্রদানের জন্য সরকারি কর্মচারী কর্তৃক আইনের নির্দেশ অমাণ্যকরণ, ভুল রেকর্ড ও লিপি প্রস্তুতকরণ; অসাধু উপায়ে সম্পত্তি আত্নসাৎকরণ; অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ; প্রতারণা; জালিয়াতি; সরকারি নথিপত্র ও রেজিষ্টার, জামানত, উইল ইত্যাদি জালকরণ; হিসাবপত্র বিকৃতকরণ, অর্থ পাচার ইত্যাদি। অন্যবিধ আর্থিক দুর্নীতি, অনুপার্জিত সম্পত্তিলাভ ও ভোগ, অর্থসম্পত্তি পাচারের দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য আয়কর

আইনেকৃত অপারাধকেও দুর্নীতিমূলক অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। কেবল জনপ্রশাসনেই নয়, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজ ও এনজিও-র দুর্নীতি প্রতিরোধকল্পে দুর্নীতি দমন আইন কার্যকর আছে। সরকার কর্তৃক অনুসৃত ক্রয় প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা আনয়ন ও দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬' ও 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮' অনুসৃত হয়। এনজিওদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের জন্য সরকার প্রণীত আইনি ও নিয়ন্ত্রণমূলক নিয়মনীতি অনুসরণ করা হয়। শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যির ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক আইনসমূহ প্রযোজ্য হয়। সামগ্রিকভাবে এই সকল আইনকানুন ও নিয়মনীতি শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপালনে অবদান রাখে।

শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়নের যৌক্তিক ভিত্তি ঃ

তত্ত্বগতভাবে বলা চলে যে, উল্লিখিত আইনকানুন ও প্রথা-পদ্ধতি এবং উন্নয়ন উদ্যোগ দুর্নীতি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে এবং তা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু অভিজ্ঞতা হতে প্রতীয়মান হয় যে, সুষ্ঠু প্রয়োগের অভাবে এগুলির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাচ্ছে না। বিভিন্ন আইন ও কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনও এখানে বড় বাধা। রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে এগুলির মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান প্রয়োজন। অতীতে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রম এত বিশাল এবং বিপুল ছিল না; সম্প্রতি কেবল সরকারি খাতই নয়, এনজিও খাত ও বেসরকারি খাতেও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিপুল প্রসার ঘটেছে। এ সকল কর্মকান্ডে বিপুল পরিমাণ সম্পদের সংশ্লিষ্টতা ঘটছে এবং পূর্বেকার সাংগঠনিক ব্যবস্থা ও পদ্ধতি এবং লোকবলের মাধ্যমে তাদের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন কষ্টকর হয়ে পড়ছে; সরকারি- ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের সজ্ঞে সংশ্লিষ্ট লোকজনের দুর্নীতির সুযোগও বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বপরি, সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের কারণে লোকজনের মধ্যে দুর্নীতির প্রবণতাও বাড়ছে বলে প্রতীয়মান হয়। পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতে সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম জোরদার করেছে; এরই সমন্বিত প্রচেষ্টা হিসাবে এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার সকল উদ্যোগের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই শুদ্ধাচার কৌশলটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থা ঃ

ক) সমাজ ও রাষ্ট্রে দুর্নীতি নির্মূল ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। রাষ্ট্র আইনকানুন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে তাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে, সমাজ তা প্রতিপালন করে; সেইসঙ্গে সমাজের নীতিচেতনা ও মূল্যবোধও রাষ্ট্রে প্রতিফলিত হয়। এই সম্পর্কের জটাজালে ব্যক্তিমানুষের নৈতিকতা ও শুদ্ধতার উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠা যেমন প্রয়োজন, তেমনি তার যুক্তরূপ প্রতিষ্ঠানগত শুদ্ধাচার উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠাও জরুরি। এই কৌশলটি চূড়ান্ত লক্ষ্য ব্যক্তিমানুষের শুদ্ধাচার, অন্য কথায় চরিত্রনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা; কিন্তু এর হাতিয়ার হিসাবে প্রতিষ্ঠানকে বেছে নেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্র, বেসরকারি ব্যবসা খাত ও সুশীল সমাজের যেসব প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে প্রতীয়মান হয়, তাদের উন্নয়ন বিবেচনা করা হয়েছে; শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানিক নিয়ম-নীতির উন্নয়ন সাধন, ক্ষেত্রবিশেষ আইন ও পদ্ধতির পরিবর্তন এবং নতুন আইন ও পদ্ধতি প্রবর্তন, লোকবলের দক্ষতার উন্নয়ন, এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে কার্যকারিতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে এ দলিলটিতে।

খ) একজন মানুষের নৈতিকতা শিক্ষা শুরু হয় পরিবারে এবং শুদ্ধাচার অনুসরণের ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। তার পরের ধাপে আছে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান; নৈতিক জীবন গড়ার ক্ষেত্র এর ভূমিকা অপরিসীম। এ প্রেক্ষাপটে শুদ্ধাচারের কৌশলে এগুলির ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। সরকারের নির্বাহী বিভাগের জনপ্রশাসন ও স্থানীয় সরকারসমূহ সরকারি কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু। এসব প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা, এবং এগুলিতে নিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠাই কৌশলটির মূল লক্ষ্য। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ তিনটি অঙ্গে বিভক্ত- আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগ। তারা স্বাধীন সত্তায় তাদের কর্মবৃত্তে যথাক্রমে রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন, নির্বাহীকার্য ও বিচারকার্য পরিচালনা করে। সংবিধান অনুযায়ী গঠিত আরও কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেমন, নির্বাচন কমিশন, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, সরকারি কর্ম কমিশন, ন্যায়পাল বাজেট ও আর্থিক নিয়মাবলী পালন সাপেক্ষে স্বাধীনভাবে কর্মসম্পাদনে ক্ষমতাবান। অন্য আরও কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যারা আলাদা ভাবে আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট এবং 'সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ' হিসেবে অভিহিত। যেমন দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য কমিশন, মানবধিকার কমিশন, ইত্যাদি। সংবিধানে স্থানীয় শাসনের যে-ব্যবস্থা নির্দেশ করা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম ও শহরের স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান যেমন, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন সৃষ্টি করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠানের সকলের ভূমিকাকেই বিবেচনা করা জরুরি। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যেমন অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে তেমনই রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ ও এনজিও এবং ব্যক্তিখাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সাকুল্যে অরাষ্ট্রীয় হিসাবে চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সার্বিক বিচারে নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে:

অ) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ঃ ১. নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন ২. জাতীয় সংসদ ৩. বিচার বিভাগ ৪. নির্বাচন কমিশন ৫. অ্যাটর্নি জেনারেল ৬. সরকারি কর্ম কমিশন ৭. মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় ৮. ন্যায়পাল ৯. দুর্নীতি দমন কমিশন ১০. স্থানীয় সরকার

আ) অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ঃ ১. রাজনৈতিক দল ২. বেসরকারি খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ৩. এনজিও ও সুশীলসমাজ ৪. পরিবার ৫. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ৬. গণমাধ্যম

রুপকল্প ও অভিলক্ষ্য ঃ

রুপকল্প (Vision) ঃ সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা।

অভিলক্ষ্য (Mission) ঃ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা।

সরকারী কর্মচারীর শুদ্ধাচারী গুনাবলী ঃ

সরকারী কর্মচারী হবেন-

১) সৎ : বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত অন্যবিধ বকশিস গ্রহন বা বিনামূল্যে মূল্যবান বস্তু গ্রহণ এবং অবৈধ ব্যবসা পরিচালনা থেকে বিরত থাকবেন।

২) দুর্নীতিমুক্ত : তিনি সকল প্রকার দুর্নীতি থেকে নিজেকে দূরে রাখবেন এবং কোন দুর্নীতিকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিবেন না।

৩) ন্যায় পরায়ন : তিনি হবেন ন্যায় পরায়ন। সকলের প্রতি সুবিচার এবং নায্য অধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিত করবেন

৪) নীতিবান : তার নিজস্ব বিবেকই হলো নীতির উৎস। তাছাড়া কথা ও কাজে মিল থাকতে হবে।

৫) দায়িত্বশীল : নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবেন।

৬) দাপ্তরিক কর্মে স্বচ্ছ : স্বচ্ছতার সাথে সকল দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করবেন এবং সকল প্রকার তথ্য অধিকার নিশ্চিত করবেন।

৭) আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল : তিনি সকল প্রকার আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবেন এবং আইনের আওতায় তিনি তাঁর সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

৮) বুদ্ধিমান : তিনি সকল দাপ্তরিক কাজ ভেবে চিন্তে করবেন এবং সহকর্মীদের নৈতিক মতামত ও ইচ্ছার মূল্য দিবেন।

৯) বন্ধুসুলভ : সহকর্মীদের প্রতি বন্ধুসুলভ মনোভাব পোষণ করবেন।

১০) কর্মদক্ষ : তিনি পেশাগত কাজ কর্মে দক্ষ হবেন।

১১) সেবা ও সহযোগী মনোভাবাপন্ন : সেবাগ্রহীতাদের প্রতি সদাচারন ও সবোর্চ্চ সেবা প্রদানে সচেষ্ট থাকবেন। এবং তিনি হবেন সহযোগিতাসুলভ।

১২) সময়ানুবর্তী : তিনি সকল কাজ সময়মত সম্পন্ন করবেন এবং সময়মত অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন।

১৩) পরিচ্ছন্ন : তিনি তার দপ্তর সর্বদা পরিচ্ছন্ন রাখবেন। তিনি নিজে পোষাকে পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন থাকবেন এবং সহকর্মীদেরও পরিচ্ছন্ন থাকতে উদ্বুদ্ধ করবেন।

১৪) জেষ্ঠ্য সহকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন।

১৫) ভাল চরিত্রের অধিকারী : তিনি সর্বদিক দিয়ে চরিত্রবান হবেন। নিজে চরিত্রবান না হলে অন্যকে তা হতে বলা যায় না। চরিত্রবান ব্যক্তি সমাজের নিকট বেশী গ্রহণযোগ্য।

সেশন-২

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভিশন ও মিশন, কার্যপরিধি, বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা SDG ও SDG বাস্তবায়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কার্যক্রম।

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মিশন ও ভিশন
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কার্যপরিধি, বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা
- SDG সম্পর্কে ধারণা
- SDG বাস্তবায়নে প্রাণিসম্পদ বিভাগের সংশ্লিষ্টতা

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ভিশন ও মিশন

রুপকল্প (Vision) ঃ

সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্পন্ন প্রাণিজ আমিষ সরবরাহকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mission) ঃ

প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ।

লক্ষ্য ঃ

ভিশন ২০২১ অনুযায়ী জনপ্রতি দুধ, মাংস ও ডিমের চাহিদার লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ২৫০ মিলি/দিন, ১২০ গ্রাম/দিন ও ১০৪টি/বছর পূরণের জন্য দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদন যথাক্রমে ৯২.৯৭ লক্ষ মেট্রিক টন, ৭১.১৮ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ১৭৬৬.০৬ কোটিতে উন্নতীকরণ।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কার্যপরিধি ঃ

১. দেশে দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
২. গবাদিপশু ও পোল্ট্রির চিকিৎসা, রোগ-প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ।
৩. গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ।
৪. গবাদিপশু ও পোল্ট্রির পুষ্টি উন্নয়ন।
৫. গবাদিপশু ও পোল্ট্রির জাত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ।
৬. প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ।
৭. গবাদিপশু ও পোল্ট্রির খামার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন।
৮. গবাদিপশু ও পোল্ট্রির কৌলিকমান-সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত গবেষণা ও উন্নয়ন।
৯. শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন।
১০. চিড়িয়াখানায় বন্য প্রাণি সংরক্ষণ ও প্রদর্শণীর মাধ্যমে বিনোদন প্রদান।
১১. দূর্যোগকালীন সময়ে জরুরী প্রাণিসম্পদ সেবা প্রদান।
১২. প্রাণিসম্পদ সংক্রান্তআইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ।
১৩. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিদ্যমান আইন ও বিধিমালাসমূহ প্রয়োগ এবং বাস্তবায়ন।
১৪. গবাদিপশু ও পোল্ট্রির খামার, পশুখাদ্য কারখানা ও প্রাণিসম্পদ উপকরন আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান সমুহের নিবন্ধন প্রদান।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিদ্যমান আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা ঃ

১. The Bengle Cruelty to Animals Act, ১৯২০. The Society for the prevention of Cruelty to Animals ordinance, ১৯৬২.
২. পশুরোগ আইন, ২০০৫।
৩. বাংলাদেশ পশু ও পশুজাতপণ্য সঙ্গ নিরোধ আইন, ২০০৫।
৪. পশুজবাই ও মাংসের মাননিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১।

৫. মৎস্য খাদ্য ও পশুখাদ্য আইন-২০১০ খ্রিঃ
৬. বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল এ্যাক্ট-২০১৯।
৭. প্রাণি কল্যাণ আইন- ২০১৯।
৮. পশুরোগ বিধিমালা, ২০০৮।
৯. পশুখাদ্য বিধিমালা, ২০১৩।

প্রাণিসম্পদ নীতিমালা ঃ

১. জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতিমালা, ২০০৭।
২. জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা, ২০০৮।

SDG (Sustainable Development Goal) ঃ SDG অর্থ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট।

জাতিসংঘ ঘোষিত ১৫ বৎসর ব্যাপী সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা MDG এর মেয়াদ শেষ হয় ২০১৫ সালে। বিশ্বের উন্নয়ন ধারাকে এগিয়ে নিতে জাতিসংঘ সাধারন পরিষদের ৬৯তম অধিবেশনে সুনির্দিষ্ঠ লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক ''টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট'' (SDG) এর খসড়া চূড়ান্ত হয়। ৭০ তম অধিবেশনে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ২০১৬ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে SDG এর মেয়াদ শুরু হয়।

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে ''২০৩০ এজেন্ডা'' এমন একটি কর্মপরিকল্পনা যা বিশ্ব শান্তি জোরদার করবে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্রসহ সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটবে। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের মূলমন্ত্র হবে; ''কাউকে পশ্চাতে রেখে নয় (No one will be left behind) নীতি অনুসরণ। জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্ধ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। গত দু'দশকে দারিদ্র বিলোপ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা অর্জন, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ছেলে-মেয়েদের হারে সমতা, পাঁচ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুর হার ও মাতৃ মৃত্যুহার কমানো প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য নন্দিত ও বিশ্ব স্বীকৃত। সহস্রাব্ধ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ ঘোষিত ''টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG)'' অর্জনেও বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নে অগ্রগতি নিরুপণের জন্য একটি ফলাফল ভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামোও প্রস্তুত করা হয়েছে।

এসডিজি'র উল্লেখযোগ্য লক্ষ্যসমূহ হলো ঃ

১) সর্বত্র সবধরনের দারিদ্রের অবসান। ২) ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার। ৩) সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ। ৪) সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি। ৫) জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী-মেয়েদের ক্ষমতায়ন। ৬) সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের জন্য টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। ৭) সকলের জন্য সাশ্রয়ী নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা। ৮) সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে অভিজাত সহনশীল অবকাঠামো নির্মান ৯) অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ। ১০) অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা। ১১) অর্ন্তভূক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাত সহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা। ১২) পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরন নিশ্চিত করা। ১৩) জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরী কর্মব্যবস্থা গ্রহন। ১৪) টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর, ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার। ১৫) স্থলজ বাস্ততন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্যহ্রাস প্রতিরোধ। ১৬) টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মান। ১৭) টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-SDG তে ১৭টি অভীষ্ট এবং ১৬৯ টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তন্মোধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ম্যাপিং অনুযায়ী ৯টি অভীষ্ট (নং-১, ২, ৩, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৫ ও ১৭) এবং ২৮টি লক্ষ্যমাত্রা প্রাণিসম্পদ সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

প্রাণিসম্পদ সেক্টর দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরী, খামারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রাণিজাত পণ্যের ভ্যালু চেইন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বে মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে। তাই বর্তমান সম্ভাবনাময় এ প্রাণিসম্পদ খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার বিভিন্ন উন্নয়ণ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ ক্ষেত্রে 'প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প' (LDDP) বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের প্রাণিসম্পদ খাতকে আধুনিকায়নে বিশেষ গুরুত্ব বহন করবে এবং SDG বাস্তবায়নে ইতিবাচক ও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং এসডিজি লিংকেজ

প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে অধিদপ্তরের প্রস্তুতি ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা সমূহ ঃ

১. দারিদ্রতা অবসানকল্পে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও বিভিন্ন ইনপুটস সরবরাহ করে বেকার ও ক্ষুদ্র খামারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করছে ফলে তাদের আয় ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং দারিদ্রতা প্রশমন হবে।

২. পুষ্টি নিরাপত্তা ও ক্ষুধা মুক্তির লক্ষ্যে গবাদিপশুর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং অনুরুপ কার্যক্রমের গতি বৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে ও হচ্ছে।

৩. জনগনের সুস্বাস্থ্য উন্নয়নে জুনোটিক রোগব্যাধি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, পোষা পশু-পাখির টিকাদান, রোগাক্রান্ত পশু সনাক্তকরণ ও সার্ভিলেন্স কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিবছর ঈদুল আযহার কোরবানির হাটে জবাইযোগ্য পশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম দেশের সকল পশুরহাটে দায়িত্ব পালন করে থাকে। ভবিষ্যতে এর পরিধি আরও বিস্তৃত করা হবে।

৪. গুনগত কারিগরী উচ্চ শিক্ষার প্রসারে সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান আছে। প্রাণিসম্পদ খাতে সাব-প্রফেশনাল জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে ৫টি প্রাণিসম্পদ ডিপ্লোমা ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়া গোপালগঞ্জে জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্টি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট স্থাপনের ফলে গুনগত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে খামারীদের উৎপাদিত দুধ, মাংস ও ডিমের পোষ্ট হার্ভেষ্ট প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ে মানসম্মত প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ সম্ভব হবে।

৫. নারীর ক্ষমতায়ণ ও নারীর অধিকার এবং কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগের সম্ভাবনায় ক্ষেত্রসমূহের অন্যতম হচ্ছে প্রাণিসম্পদ খাত। চলমান উন্নয়ন বিভিন্ন উন্নয়ণ প্রকল্পে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রাণিসম্পদ খাতে নারীর অংশগ্রহনের হার প্রায় ৫০%। নতুন প্রকল্পে নারীরা প্রতক্ষ্যভাবে সম্পৃক্ত হবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও বৃদ্ধি পাবে।

৬. টেকসই জ্বালানী উন্নয়নে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর উদ্যোগে 'ইন্টিগ্রেটেড লাইভস্টক ম্যানিউর ম্যানেজম্যান্ট' এর এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এটি বাস্তবায়ন করতে পারলে টেকসই জ্বালানীর ব্যবহার বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

৭. টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানো ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য প্রাণিসম্পদ খাতের শিল্পায়ন ও রপ্তানীমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ফলে প্রাণিজাত পণ্যে মূল্য সংযোজিত হবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি সম্প্রসারিত নবভিত্তির রচনা করতে পারবে।

৮. উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প এবং পশুরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের মাধ্যমে কোয়রেন্টাইন স্টেশন স্থাপনসহ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভিন্ন অবকাঠামোতে উন্নয়ন করা হচ্ছে।

৯. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বাস্তসংস্থান সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে চিড়িয়াখানার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে।

১০. সুশাসন নিশ্চিতকল্পে দাপ্তরিক কার্যক্রমে অধিকতর প্রযুক্তির ব্যবহার, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী নৈতিকতা ও শুদ্ধাচার কৌশল পালন করা হবে।

১১. প্রাণি ও প্রাণিজাত পণ্য সহ অন্যান্য প্রচলিত ও অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানির নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি, প্রযুক্তির হস্তান্তর, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য সমঝোতা স্মারক ইত্যাদি কার্যক্রম ক্ষেত্রবিশেষ শুরু ও বেগবান করা হবে।

সেশন-৩

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) এর পরিচিতি।
প্রকল্প বাস্তবায়নে উপসহকারী প্রাণিসম্পদ অফিসার এবং ফিল্ড এসিস্টেন্ট এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- এলডিডিপি এর বিভিন্ন কম্পোনেন্ট এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
- এলডিডিপি-এর কম্পোনেন্ট এর ইনপুট, আউটপুট, আউটকাম এবং ইমপ্যাক্ট
- এলডিডিপি এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমসমূহ
- উপসহকারী প্রাণিসম্পদ অফিসার এবং ফিল্ড এসিস্টেন্ট এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্ব ব্যাংক এর যৌথ অর্থায়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়াধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের একটি বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প। প্রকল্পটির মেয়াদ ৫ বছর। পহেলা জানুয়ারি, ২০১৯ থেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান থাকবে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

প্রাণিসম্পদ খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ, প্রডিউসার অর্গানাইজেশন গঠন, মার্কেট লিংকেজ এবং ভ্যালু চেইন উন্নয়নে টেকসই বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করা। নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ বৃদ্ধির পাশাপাশি আর্ন্তজাতিক বাজারে প্রাণিজাত পণ্য প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত করা। প্রকল্পের উল্লেযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে-

১. প্রাণিস্বাস্থ্য, প্রাণিপুষ্টি ও প্রাণি প্রজনন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা ২০% বৃদ্ধি করা।
২. প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি সেক্টরে ৫৫০০টি প্রোডিউসার গ্রুপ তৈরী করা। প্রোডিউসার গ্রুপগুলিকে বাজার ব্যবস্থার সাথে লিংকেজ স্থাপন এবং মূল্য সংযোজন প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন ঘটানো।
৩. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ নীতিমালা তৈরী, জনবলের দক্ষতা উন্নয়ন, তদারকি, মূলায়ন এবং উপকরণ সহায়তার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ।
৪. নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন এবং প্রাণিজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
৫. প্রাণিসম্পদ বীমা ব্যবস্থা চালুকরনের মাধ্যমে খামারিদের বিনিয়োগ নিরাপদকরণ এবং পরিবেশ সহায়ক প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থা জোরদারকরণ।

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প(এলডিডিপি) এর বিভিন্ন কম্পোনেন্টের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ

প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ	সাব-কম্পোনেন্ট	প্রধান পদক্ষেপ সমূহ
কম্পোনেন্ট-A উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও ইনোভেশন	• সাব-কম্পোনেন্ট -A1 প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনগুলোকে সহায়তা • সাব-কম্পোনেন্ট-A2 উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা	• একই পণ্যগুলোর প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনকে সহায়তা প্রদান ও তাদের ব্যবসায় দক্ষতা বৃদ্ধি • ফিডিং এবং নিউট্রিশন • রোগ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ • গৃহায়ন ও ব্যবস্থাপনা • ডেমোনেস্ট্রেশন, প্রদর্শনী

কম্পোনেন্ট-B মার্কেট লিংকেজ এবং ভ্যালু চেইন ডেভেলপমেন্ট	• সাব-কম্পোনেন্ট-B1 প্রডাক্টিভ পার্টনারশিপের মাধ্যমে মার্কেট লিংকেজ	• এগ্রিবিজনেস (ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (SME), ব্যবসায়ী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান (FIS), প্রসেসর, অনগ্রসর কৃষি ব্যবসা সমূহ) এবং লাইভস্টক প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন • স্কুল মিল্ক প্রোগ্রাম • পুষ্টি সচেতনামূলক প্রশিক্ষণ এবং প্রচারণা।
	• সাব-কম্পোনেন্ট-B2 প্রাণিসম্পদের জন্য সরকারি অবকাঠামো	
	• সাব-কম্পোনেন্ট-B3 ভোক্তা সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নিউট্রিশন	
কম্পোনেন্ট- C ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং প্রাণিসম্পদ উৎপাদন পদ্ধতির স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি	• সাব-কম্পোনেন্ট-C1 প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নলেজ প্লাটফর্ম	• সাব-সেক্টর গুলোর তদারকির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক গঠন এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
	• সাব-কম্পোনেন্ট-C2 খাদ্য নিরাপত্তা এবং গুণগতমান নিশ্চিতকরণ	• বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা প্রদান। • খাদ্য ও পরিবেশের নিরাপত্তা ইস্যুতে ICT ব্যবহার
	• সাব-কম্পোনেন্ট-C3 প্রাণিসম্পদ ঝুঁকি প্রশমন	• প্রাণিসম্পদ ঝুঁকি প্রশমনের জন্য পূর্বশর্ত নির্ণয় • জাতীয় প্রাণিসম্পদ ডাটাবেজ তৈরী • সচেতনামূলক প্রচারণা, প্রশিক্ষণ এবং মোটিভেশনাল কার্যক্রম
	• সাব-কম্পোনেন্ট-C4 আকস্মিক ঘটনার জরুরি প্রতিক্রিয়া	• কোন প্রতিকূল প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট ঘটনার পর জরুরি ভিত্তিতে ফান্ড মোবাইলাজকরণ
কম্পোনেন্ট-D প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন	কম্পোনেন্ট-D ডিএলএস হেড কোয়ার্টার এ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (PMU) প্রতিষ্ঠা	• ঢাকায় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রতিষ্ঠা এবং • ইউএলও (ULO), ডিএলও (DLO), এবং ডিডি (DD Office) অফিসে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (PIUs) প্রতিষ্ঠা

প্রকল্পের ইনপুট (INPUTS) ঃ

টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্টস/কারিগরী সহায়তা শক্তিশালী করে-

১. প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের দক্ষতা বৃদ্ধি
২. নীতি ও নিয়ন্ত্রক পরিবেশ সৃষ্টি
৩. সরকারি ও বেসরকারি প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ, প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তাসহ প্রাণিচিকিৎসা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং পশুপ্রজনন সেবা সংস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি
৪. টেকনিক্যাল এবং বিজনেস ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস উন্নয়ন
৫. কৃষি উদ্যোক্তা ও প্রোডিউসারদের আর্থিক বিষয়াবলিতে অ্যাক্সেস বৃদ্ধি
৬. নবায়নযোগ্য শক্তিতে কৃষি উদ্যোক্তাদের অ্যাক্সেস বৃদ্ধি

প্রকল্পের বিনিয়োগ (INVESTMENTS) ঃ

১. লাইভস্টক ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম
২. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো
৩. ফিজিবিলিটি স্টাডিজ (DDB, BDRI, BPRI, TMR, DTMR)
৪. ক্রিটিক্যাল ভ্যালু চেইন ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাজার
৫. কো-ফাইন্যান্স পদ্ধতিতে বিজনেস প্ল্যান
৬. নবায়নযোগ্য শক্তির জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার (বায়োডাইজেস্টার, সোলার প্যানেল)
৭. স্কুল মিল্ক ফিডিং প্রোগ্রাম

প্রকল্পের আউটপুট (OUTPUTS) ঃ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের দক্ষতা সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রোডিউসার অর্গানাইজেশনের জন্য উন্নততর সেবা প্রদান-

১. সেবা, ইনোভেশন ও বাজারীকরনের কার্যকরী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে স্ব স্ব ভ্যালু চেইনে প্রতিষ্ঠিত প্রোডিউসার গ্রুপ তৈরি।
২. উন্নততর কারিগরী ও বিজনেস ডেভেলপমেন্ট সহায়তা সেবা ।
৩. নলেজ প্ল্যাটফর্ম ও লাইভস্টক ইনফরমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে নলেজ প্রোডাক্ট বিতরণ।
৪. নির্ধারিত লাইভস্টক ভ্যালু চেইনের মাধ্যমে উন্নত পদ্ধতিতে তথ্য প্রচার করা।
৫. প্রডিউসার গ্রুপ ও লাইভস্টক উদ্যেক্তাদের উন্নত, আবহাওয়া সহিষ্ণু ও প্রোডাক্টিভিটি বর্ধক প্রযুক্তি আত্নীকরণ।
৬. ক্রিটিকাল ভ্যালু চেইন অবকাঠামো নির্মাণ/উন্নয়ন/সংস্কার ।
৭. ক্রিটিক্যাল রিনিউয়েবল এনার্জি/নবায়নযোগ্য শক্তির অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা।

প্রকল্পের আউটকাম (OUTCOMES) ঃ

১. প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ক্ষমতা বর্ধন ও সহনশীলতা বৃদ্ধি।
২. প্রোডিউসার গ্রুপ ও প্রাণিসম্পদ উদ্যোক্তাদের জন্য উন্নততর নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ সৃষ্টি।
৩. বিভিন্ন উন্নত সুবিধাদিতে (কোয়ারেন্টাইন, ব্রিডিং, স্টোরেজ , প্রসেসিং , প্যাকেজিং, কোয়ালিটি কন্ট্রোল , আই সিটি) এবং অর্থ সংক্রান্ত বিষয়াদিতে এক্সেস।
৪. প্রকল্প এলাকাতে রিনিউয়েবল এনার্জির সাপ্লাই বৃদ্ধি।
৫. কারিগরী ও বিজনেস এডভাইজরি সার্ভিসে প্রডিউসার গ্রুপের ও কৃষি উদ্যোক্তাদের এক্সেস বাড়ানো এবং তাদের দ্বারা বিনোয়োগে অর্থায়ন।
৬. বাজারে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত উচ্চ গুনগতমান সম্মত পণ্যের বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি।

প্রকল্পের ইমপ্যাক্ট (IMPACTS) ঃ

১. প্রাণিসম্পদ খাতের টেকসই উন্নয়ন ২. দারিদ্রতা হ্রাস ৩. কর্মসংস্থান সৃষ্টি ৪. জেন্ডার ইকুইটি ৫. জনস্বাস্থ্য

এলডিডিপি এর আওতায় বাস্তবানাধীন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমুহ ঃ

১. বেসরকারি উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় ৩০০টি ভিলেজ মিল্ক কালেকশন সেন্টার (VMCC) স্থাপন।
২. আঞ্চলিক পর্যায়ে ২০টি ডেইরি হাব (DH) স্থাপন।
৩. দুধ উৎপাদন এলাকায় ১৭৫টি মিল্ক কুলিং সেন্টার (MCC) স্থাপন।
৪. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৪১৫টি দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরন ইউনিট স্থাপন।
৫. পশুজবাই ও মাংস প্রক্রিয়াকরণের জন্য মেট্রোপলিটন/সিটিকর্পোরেশন এলাকায় ৩টি আধুনিক স্লটারহাউজ নির্মাণ।
৬. জেলা পর্যায়ে ২০টি স্লটারহাউজ নির্মাণ।
৭. উপজেলা পর্যায়ে ১৯২টি মাংসের বাজার উন্নয়ন।
৮. খামারের বর্জ্য দিয়ে বায়োগ্যাস এবং বায়োফার্টিলাইজার উৎপাদন ও বিপণনের লক্ষ্যে ১০জন বেসরকারি উদ্যোক্তা তৈরী।
৯. ভেটেরিনারি সেবার মানউন্নয়নের জন্য উপজেলা পর্যায়ে মিনি ডায়াগনোস্টিক ল্যাব স্থাপন।
১০. ৩৬০ টি উপজেলায় মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক কার্যক্রম চালু।
১১. ২৩৮টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মান।
১২. ভোক্তা সৃষ্টি ও পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পাইলট আকারে ২০০০টি স্কুলে মিল্ক ফিডিং (SMF) কর্মসূচী পরিচালনা।
১৩. প্রকল্প এলাকায় পাইলট আকারে প্রাণিসম্পদ বীমা কার্যক্রম চালু।
১৪. প্রকল্প এলাকায় সম্প্রসারণ সেবা খামারী দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে ৪২০০ জন লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) তৈরী।
১৫. প্রকল্প এলাকায় ৫৫০০টি প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট প্রোডিউসার গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করা।

১৬. প্রকল্প এলাকায় ১৯১০০০ জন সুফলভোগী নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ প্রদান।

১৭. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান।

১৮. প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন।

১৯. প্রাণিসম্পদের লাগসই প্রযুক্তি উন্নয়নে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

২০. ডেইরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড প্রতিষ্ঠা।

প্রকল্প বাস্তবায়নে উপসহকারী প্রাণিসম্পদ অফিসার(এসএএলও)/ভেটেরিনারি ফিল্ড এসিসটেন্স(ভিএফএ)/লাইভস্টক ফিল্ড এসিস্টেন্ট (এলএফএ) এর দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

১. প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সকল কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকবেন।

২. প্রতিমাসের কর্ম পরিকল্পনা এবং অগ্রীম ভ্রমণসূচি অনুমোদন পূর্বক নির্দিষ্ট ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে এবং এক কপি প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। উপজেলার প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার ব্যবস্থাপনা মোতাবেক দায়িত্ব প্রাপ্ত ইউনিয়ন সমূহের মধ্যস্থলের যে কোন একটি ইউনিয়ন প্রাণিসম্পদ সেবা কেন্দ্রে অবস্থান করবেন।

৩. নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ফার্মারস অর্গানাইজেশন ও প্রডিউসার অর্গানাইজেশন গঠন এবং গ্রুপ মবিলাইজেশনের জন্য প্রতি মাসে কমপক্ষে ১৬ দিন অনুমোদিত ভ্রমণসূচি মোতাবেক মাঠ পর্যায়ে কাজ করবেন।

৪. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং এলএসপিদের সহযোগিতা করবেন।

৫. ইউনিয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রমের সমন্বয় করবেন।

৬. স্কুল মিল্ক ফিডিং প্রোগ্রাম, VMCC (Village milk collection centre) কার্যক্রমে সহযোগিতা করবেন।

৭. কৃষক সমাবেশ উদ্বুদ্ধ করণসভা , ফার্মারস ফিল্ড স্কুল (FFS), মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক (MVC), Deworming এবং Vaccination Campaigning, প্রকল্প সহায়তা Grant, Sub Grant, Matching Grant, Demonstration প্রভৃতি কাজে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করবেন।

৮. কর্ম এলাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত LFA গণ প্রতি মাসে নূন্যতম ২ বার এলএসপিদের মাসিক সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করবেন এবং LSP দের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন পেশ করবেন।

৯. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল সভা ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন এবং তথ্যাদি ও রেকর্ড পত্র সংরক্ষণ করবেন।

১০. পিএমআইএস এ সার্বক্ষণিক যুক্ত থেকে তথ্য প্রদান নিশ্চিত করবেন।

১১. ইউনিয়নে প্রডিসার অর্গানাইজেশন সদস্যসহ অন্যান্য খামারীদের সকল গবাদিপশু এবং পোল্ট্রির তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে সহযোগিতা করবেন।

১২. প্রতিমাসের শেষ সপ্তাহে পরবর্তী মাসের কর্ম পরিকল্পনা প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণ করবেন।

১৩. প্রকল্পের সকল নিয়মকানুন মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন এবং প্রকল্পের স্বার্থে কর্তৃপক্ষের সকল আদেশ নির্দেশ যথাযথভাবে মেনে চলবেন।

১৪. অগ্রীম ভ্রমণসূচি অনুসারে প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী কর্মএলাকায় গ্রামভিত্তিক ভ্যাকসিনেশন ও ডিওয়ামিং ক্যাম্প স্থাপন, সচেতনামূলক ক্যাম্পেইন বা খামারি সমাবেশ আয়োজন, কৃষক মাঠ স্কুল,খামারি মাঠ দিবস, ফিল্ড ভিজিট, মতবিনিময় সভা প্রভৃতি আয়োজন করবেন।

১৫. সাপ্তাহিক শেষ কর্মদিবস (বৃহস্পতিবার) অপরাহ্নে দাপ্তরিক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ,সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং সম্প্রসারণ রেজিষ্টার সমূহ হালনাগাদ করবেন।

১৬. প্রকল্পে দপ্তরের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনে সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও দায়িত্ব পালন করবেন।

সেশন - ৪

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সংগঠন ব্যবস্থাপনা

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- ➢ মানব সম্পদ উন্নয়ন সর্ম্পকে ধারণা
- ➢ মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায়
- ➢ সংগঠন সর্ম্পকে ধারণা
- ➢ সংগঠন ব্যবস্থাপনা

মানবসম্পদ উন্নয়ন বলতে কি বুঝায় ?

মানব সম্পদ উন্নয়ন হলো এমন একটি আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নির্দেশক যা ব্যাক্তির সামাজিক মর্যাদা বা অবস্থান নির্ধারণ করে। এটি মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, প্রত্যাশিত গড় আয়ুস্কাল বৃদ্ধি, শিশু মৃত্যু হার হ্রাস এবং শিক্ষার বৃদ্ধির সাথে সংশ্লিষ্ট। এটি এমন একটি উন্নততর অবস্থানের নাম যেখানে প্রতিটি ব্যাক্তি তার সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ এবং যথাযথ কর্মশক্তি নিয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সেবাগুলো যেমন-নূন্যতম আহার, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, চিত্ত-বিনোদন ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা পূরণ করে মানসম্মত জীবন নিশ্চিত করে।

প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন ঃ

প্রশিক্ষণ হচ্ছে মানব সম্পদ উন্নয়নের সর্বাধিক কার্যকর হাতিয়ার। প্রতিষ্ঠানিক কাজে মানব সম্পদকে সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হলে তাদের দক্ষতা ও উপযুক্ততা থাকলেই চলবে না বরং কিভাবে তারা সে দক্ষতা ও উপযুক্ততাকে প্রতিষ্ঠানের কাজে লাগাতে পারে সেদিকেও নজর দিতে হবে। মানবসম্পদ নির্বাচন ও নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনাকে অনেক কিছুর সাথে বিবেচনা করতে হয়। এক্ষেত্রে একমাত্র প্রশিক্ষণই সকল সীমাবদ্ধতাকে দূরীভূত করে দক্ষ ও উপযুক্ত মানব সম্পদ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে। দেশ যত দ্রুত উন্নয়ন হচ্ছে প্রযুক্তির তত পরিবর্তন ঘটছে ফলে পুরানো কর্মীদের পুনঃপ্রশিক্ষণের প্রয়োজন ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই নতুন পুরানো সকল কর্মীর ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষণ সমানভাবে প্রযোজ্য।

মানব সম্পদ ঃ

সাধারণত দক্ষতা সম্পন্ন মানুষকে মানব সম্পদ বুঝায়। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Human Resource Management) একই সঙ্গে একটি ব্যবস্থাপনা ও কৌশল যা কোন প্রতিষ্ঠানের অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য আভ্যন্তরীন মানব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাকে নির্দেশ করে। কর্মীদের প্রতিষ্ঠানের সু-সম্পর্ক বজায় রাখা, তাদের কর্মজীবনে উত্তরোত্তর উন্নয়নের পথ সৃষ্টি করা এবং প্রয়োজনে তাদের বাছাই করা সহ প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ সম্পর্কিত সব ধরনের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

মানব এবং সম্পদ এর মধ্যে সম্পর্ক ঃ

- মানব কখন 'মানব সম্পদ' হিসেবে বিবেচিত হবে? মানব সম্পদ (Human resource) সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক বা জন্মগত নয়। সাধারণ মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে মানবসম্পদে পরিণত হয়। মানুষ এবং মানব সম্পদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন–

- কোনো ব্যক্তিকে তখনই সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হবে যখন সে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে। মানব সম্পদের প্রয়োজনীয় উপাদান হলো সুস্বাস্থ্য ও দৈহিক সামর্থ।

- কোনো ব্যক্তিকে তখনই সামাজিক দিক থেকে উপযোগী বা সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হবে যখন সে সামাজিক কোনো না কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় দক্ষতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

- প্রত্যেক মানুষের সাধারণ মানসিক ক্ষমতার সঙ্গে কিছু না কিছু বিশেষ মানসিক ক্ষমতা থাকে। এই বিশেষ মানসিক ক্ষমতা তাকে কোনো বিশেষ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সহায়তা করে। এই বিশেষ মানসিক ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিকে মানবসম্পদ বলা হয়।

মানবকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য উপাদান হচ্ছে শিক্ষা। কোনো ব্যক্তিকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হবে তখনই যখন সে সামাজিক নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী শিক্ষা অর্জন করবে।

মানবসম্পদ উন্নয়নের উপায় সমূহ ঃ

- **আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ঃ** প্রাথমিক শিক্ষা স্তর থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাঠামোর মাধ্যমিক শিক্ষা এবং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ পর্যায়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষাকে বোঝানো হয়েছে।
- **কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ঃ** ধারাবাহিক বা উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা।
- **আত্ম উন্নয়ন ঃ** যেমন– জ্ঞান, দক্ষতা ও সামর্থ্যের উন্নয়ন যা ব্যক্তি তার নিজের চেষ্টায় আনুষ্ঠানিক উপায়ে অথবা দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে অনানুষ্ঠানিক উপায়ে পড়ে বা অন্যের কাছ থেকে শিখে নিজের আগ্রহ ও কৌতূহল অনুযায়ী ব্যাপক গুণমান, দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে তৈরি করে।
- **স্বাস্থ্য উন্নয়ন ঃ** উন্নততর চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং মানব স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মরত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য উন্নয়ন।
- **পুষ্টি উন্নয়ন ঃ** পুষ্টি মানুষের কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে মানুষ অধিক সময় ধরে কাজ করতে পারে এবং তার কর্মজীবন দীর্ঘ হয়। পুষ্টির উন্নয়ন মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।
- **শিক্ষার সম্প্রসারণ ঃ** বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা বিশেষ করে গবেষণা ও কারিগরী শিক্ষার সম্প্রসারণ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত।
- **নৈতিকতাবোধ জাগ্রতকরণ ঃ** নৈতিকতাবোধ জাগ্রতকরণ এবং বিবেক-বিবেচনাবোধ সম্পন্ন মানুষ গঠন, দেশ প্রেমের দীক্ষা গ্রহণ, ব্যক্তিগত দক্ষতা উন্নয়ন। শুদ্ধাচার, শিষ্টাচার এর সঠিক অনুশীলনই মানুষকে সম্পদে উন্নীত করে।

সংগঠন ব্যবস্থাপনা ঃ

সংগঠন বা দল বলতে একই শ্রেণীর বা পেশার অথবা একই গোত্রের কয়েকজন মানুষ মিলিত হয়ে নিজেদের উন্নয়নের জন্য সংঘবদ্ধ কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করাকে বুঝায়।

সংগঠন বা দলের উদ্দেশ্য;

অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ঃ

ক) সঞ্চয়ী মনোভাব সৃষ্টি করা। খ) ঋণদানের সুযোগ সৃষ্টি করা। গ) আয় করার জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

সামাজিক উদ্দেশ্য ঃ

- ✓ দলের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান ও একতা বৃদ্ধি করা * সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় কাজ করা।
- ✓ দারিদ্রের কারণ চিহ্নিত করা ও আর্থ-সামাজিক স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করা
- ✓ দলের সদস্য/সদস্যাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা
- ✓ প্রাতিষ্ঠানিক নির্ভরতা কমানো।
- ✓ নিজের সংঘবদ্ধ করা
- ✓ দলের ঋণ কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- ✓ এলাকার সামাজিক উন্নয়ন করা।
- ✓ দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- ✓ নিজেদের উন্নয়ন করা।

সংগঠন বা দল ব্যবস্থাপনা ঃ

- ✓ এমন একটি কার্য ব্যবস্থাকে বুঝায় যার মাধ্যমে দলসমূহ সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালিত হয়।
- ✓ দল যে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির দ্বারা পরিচালিত হয় তাকে দল ব্যবস্থাপনা বলে।
- ✓ যে প্রক্রিয়া দলের প্রতিটি কর্মকান্ডকে পরিচালিত করে তাকেই দল ব্যবস্থাপনা বলে।
- ✓ দলের লক্ষ্য অর্জনের জন্য দল যেভাবে কাজ করে/পরিচালিত হয় তাই দল ব্যবস্থাপনা।

দল পরিচালনার কৌশল ঃ

- ✓ দল পরিচালনার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে সম্মত থাকা।
- ✓ দলের সহকর্মীদের সাহায্য করার মনোভাব থাকা।
- ✓ সাফল্যের জন্য দলের সদস্যদের স্বীকৃতি দেয়া।
- ✓ সাফল্যের সুনাম সকলের সাথে ভাগ করে নেওয়া।
- ✓ সহকর্মীদের সাথে সব সময় নিজের কাজের সমন্বয় করা।
- ✓ দলের সদস্য হিসেবে কাজ করতে অবশ্যই পছন্দ করা।
- ✓ গণতান্ত্রিক দল ব্যবস্থাপনার প্রতি বিশ্বাস রাখা।
- ✓ দলের ঐক্য বজায় রাখা ইত্যাদি।

দলের গঠনতন্ত্র তৈরীর নিয়মাবলী ঃ

দল গঠন হওয়ার প্রথম বছরের মধ্যেই গঠনতন্ত্র তৈরী করা প্রয়োজন।
সভায় গঠনতন্ত্র তৈরীর জন্য সহায়ক প্রশ্নাবলী নিয়ে আলোচনা করা দরকার।
উন্নয়নকর্মী সরাসরি প্রশ্নের উত্তর বলে দেবেন না। তাঁরা নিজেরা যাতে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পান সে জন্য সাহায্য করবেন।
প্রত্যেক সদস্য যাতে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর সময় নিয়ে চিন্তা করে দিতে পারেন সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।
কোন প্রশ্ন বোঝা না গেলে উন্নয়ন কর্মী উদাহরণসহ প্রশ্নের উত্তর বুঝিয়ে দিবেন।
দলীয় সভায় অধিকাংশ সদস্যই যেন উপস্থিত থাকেন সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।
সবাই একমত হয়ে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্নের উত্তর লিখবেন।
যে কোন একজন লেখাপড়াজানা সদস্য প্রশ্নপত্র পূরণ করবেন।
দলীয়ভাবে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে গঠনতন্ত্রটি চূড়ান্ত রূপ লাভ করবে।
চূড়ান্ত গঠনতন্ত্রের শেষ পৃষ্ঠায় প্রত্যেক সদস্যের সম্মতিসূচক স্বাক্ষর থাকবে।

প্রডিউসার অর্গানাইজেশন গঠন ঃ

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ডেইরি খামার, পোল্ট্রি খামার, ছাগল ও ভেড়ার খামারের মালিকদের নিয়ে ক্লাস্টারভিত্তিক প্রডিউসার অর্গানাইজেশন গঠন করা হবে। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য খামারী ও জনগণের সার্বিক অংশগ্রহণে খামারীদের ক্ষমতায়ন, তাঁদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ এবং পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার জন্য প্রডিউসার অর্গানাইজেশন কাজ করবে। একই ধরনের আর্থ-সামাজিক অবস্থাসম্পন্ন এবং একই উদ্দেশ্যে একই ধরণের খামার ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত খামারীদের নিয়ে প্রডিউসার অর্গানাইজেশন কাজ করবে। প্রডিউসার অর্গানাইজেশন স্থানীয় চাহিদা মোতাবেক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। কৃষকদের মাঝে আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণে কাজ করবে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদন ও বিপণন কাজে সম্পৃক্ত থাকবে। খামারীদের অধিকার সচেতন করে তোলা এবং অধিকার সংরক্ষণে কাজ করবে।

সেশন-৫

প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কৌশল

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- সম্প্রসারণ ও সম্প্রসারণ নীতিমালা
- সম্প্রসারণ কর্মীর বৈশিষ্ট্য
- প্রযুক্তি প্রদর্শনী পদ্ধতি
- প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন

প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কৌশল।

সম্প্রসারণঃ

সম্প্রসারণ হলো নতুন ধারণা বা প্রযুক্তির যোগান দেওয়া যা বিশেষজ্ঞের উৎস থেকে গ্রামীণ জনগণের মাঝে বিস্তার ঘটে থাকে। এ ধরণের সম্প্রসারণকে প্রযুক্তিকেন্দ্রীক বা টপ ডাউন সম্প্রসারণ বলা হয়। অর্থাৎ কোন অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর জ্ঞান দক্ষতা, মনোভাব বা আচরণে পরিবর্তন আনার জন্য কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক গৃহীত, সংঘটিত এবং সমন্বিত যোগাযোগ প্রচেষ্টার সমষ্টিই সম্প্রসারণ। সম্প্রসারণ উন্নয়ন কার্যক্রমকে সহায়তা করে। অর্থাৎ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ বা বিস্তারের পদ্ধতি হলো সম্প্রসারণ।

সম্প্রসারণ নীতিমালাঃ সম্প্রসারণের মূলনীতি ৫টি।

১. সম্প্রসারণ খামারিদের নিয়ে কাজ করে। কর্মীদের নিজেদের জন্য নয়। খামারি নিজেই তার জমি, খামার বা জীবিকা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সম্প্রসারণ কর্মী কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারে না। সম্প্রসারণ কর্মীকে খামারির বর্তমান অবস্থা এবং তার মতামতের ভিত্তিতে কাজ করতে হয়।

২. সম্প্রসারণ কর্মীর দুই ধরণের কর্তৃপক্ষ থাকে যেমন: উর্দ্ধতন কর্মকর্তা এবং এলাকার সুফলভোগী খামারি। সম্প্রসারণ কর্মী উভয়ের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

৩. সম্প্রসারণ একটি সাংগঠনিক ও সমন্বিত যোগাযোগ প্রক্রিয়া। খামার থেকে গবেষকদের কাছে তথ্য স্থানান্তরে সম্প্রসারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খামারিদের সাথে গবেষকদের নিয়মিত যোগাযোগের সুযোগ সৃষ্টি করে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সুপারিশকৃত কাজগুলো খামারিরা হাতেকলমে করার সুযোগ পায় এবং সমস্যাসমূহ গবেষকদের কাছে প্রত্যাবর্তন করে।

৪. সম্প্রসারণ বিভিন্ন খামার সমিতি, প্রডিউসার অর্গানাইজেশন বা সংস্থার সাথে কাজ করে। যে সকল উন্নয়ন সংস্থা খামারি ও তার পরিবারকে সেবা বা সহযোগিতা দিয়ে থাকে সম্প্রসারণ কর্মীকে তাদের সাথে কাজ করা প্রয়োজন।

৫. সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া বিভিন্ন অভিষ্ট দলের সাথে কাজ করে। সম্প্রসারণ কর্মীকে সচেতন থাকতে হবে যে, এক এলাকার সমস্ত খামারিদের সমস্যা এক নয়। সম্প্রসারণ কোন এলাকা বা অঞ্চলের সমস্ত খামারিদের জন্য একটি একক প্যাকেজ প্রদান করতে পারে না।

সম্প্রসারণ কর্মীর বৈশিষ্টাবলী ঃ

একজন সার্থক সম্প্রসারণ কর্মীর অনেক বৈশিষ্ট থাকতে হয়। তার কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

● মানুষের উন্নয়নে কাজ করার মানসিকতাসম্পন্ন ● সঠিক পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাধারী ● সৃজনশীল ● অন্যদের জন্য উদাহরণ সৃষ্টি করায় সক্ষম ● অন্যের মতামতকে শ্রদ্ধাকারী ● জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন এবং ভাল সংগঠক ● উৎপাদনশীল কাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করায় সক্ষম ● গ্রহণযোগ্যতা ● ভাল শিক্ষক ● ভাল শ্রোতা ও উপযোগী পরামর্শক।

এলডিডিপি'র আওতায় প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রম ঃ

প্রযুক্তি সনাক্তকরণ, বাস্তবায়ন এবং প্রদর্শণীর জন্য নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে -

১. কৃষক গ্রুপ/খামারিগণ এলডিডিপি এর প্রস্তাবিত কাঠামোর মধ্যে প্রযুক্তি সনাক্ত করবেন। প্রতিটি গ্রুপ এর প্রদর্শণীর সংখ্যা নির্ভর করছে ঐ গ্রুপের এর সক্ষমতা, সম্ভাবনা এবং সুযোগের উপর। প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট উৎপাদনে কৃষক/খামারীর দক্ষতার উপর ভিত্তি করে প্রদর্শণী পরিচালনার জন্য কৃষক/খামারী-কে নির্বাচন করা হবে।

২. যদি একটি নির্দিষ্ট প্রযুক্তি একাধিক স্থানে প্রদর্শীত হয়, সে ক্ষেত্রে হিসাব করা হবে এক প্রযুক্তি দ্বারা দুইটি প্রদর্শণী করা হয়েছে। সকল প্রকার প্রযুক্তি প্রদর্শণীদের মাঠে/খামারে/প্লটে প্রদর্শিত হবে।

৩. প্রযুক্তি প্রদর্শণী আয়োজনে এলডিডিপি থেকে সকল প্রকার উপকরণ সরবরাহ করা হবে এবং কৃষক/খামারী উক্ত প্রদর্শণীতে প্রয়োজনীয় শ্রম ও জমি/খামারী প্রদান করবেন।

৪. প্রদর্শণীর জন্য নির্ধারিত কৃষক/খামারী প্রদর্শণকৃত প্রযুক্তি গ্রহণে প্রতিবেশী কৃষক/খামারীদেরকে উৎসাহিত করবেন।

৫. প্রদর্শণীর জন্য নির্ধারিত কৃষক/খামারী উক্ত প্রদর্শণীর মাঠ দিবস পরিচালনায় এলএসপি-কে সর্বাত্নক সহযোগিতা করবেন।

৬. প্রতিটি প্রদর্শণীর জন্য একটি করে মাঠ দিবস থাকতে হবে। দলীয় সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় প্রদর্শণীর ফলাফল অর্থাৎ উৎপাদনের দিন এই মাঠ দিবসের অয়োজন করা হবে।

৭. প্রতিটি প্রযুক্তি প্রদর্শণীতে তথ্যবহুল দৃশ্যমান সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে।

প্রযুক্তি প্রদর্শণীর জন্য কৃষক/খামারী নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় ঃ

১. প্রদর্শণীর জন্য নির্বাচিত/মনোনয়নকৃত কৃষক/খামারী অবশ্যই প্রগতিশীল, স্থায়ী বাসিন্দা এবং স্থানীয়ভাবে সকলের নিকট সুপরিচিত হবেন।

২. তিনি বাংলা পড়তে ও লিখতে পারবেন।

৩. প্রদর্শণীর জন্য তার প্রয়োজনীয় প্রাণি/চাষাযোগ্য জমি ইত্যাদি থাকবে এবং তিনি উক্ত প্রাণি/জমি প্রদর্শণীর কাজে ব্যবহার করতে ইচ্ছুক থাকবেন।

৪. প্রদর্শণী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ এবং নেতৃত্বের গুণাবলী ও উদ্বুদ্ধকরণের ক্ষমতাসম্পন্ন হবেন।

৫. তিনি নতুন/উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ এবং বাণিজ্যিক খামার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হবেন।

৬. নতুন/উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণে কৃষক/খামারীদের তিনি সহায়তা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবেন।

৭. প্রদর্শণীর শর্তাবলী পালনে তিনি সম্পূর্ণরূপে সম্মত হবেন।

প্রযুক্তি প্রদর্শণী প্লট/খামার নির্বাচনে নিম্নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন-

১. প্রদর্শণী প্লট/খামারগুলো অবশ্যই দৃশ্যমান স্থানে হওয়া উচিৎ যাতে কৃষক/খামারীগণ উক্ত প্রদর্শণী প্লট/খামারগুলোতে সহজেই প্রবেশ করে প্রযুক্তি গ্রহণ করতে পারেন। এ জন্য রাস্তার পার্শ্বের প্রদর্শণী প্লট/খামারগুলো অগ্রাধিকারযোগ্য।

২. প্রদর্শণী প্লট/খামারগুলো উচু জমিতে করতে হবে যাতে বন্যায় প্রদর্শণী প্লট/খামার ক্ষতি না হয় এবং সারা বছর ব্যবহারযোগ্য হয়।

প্রযুক্তি প্রদর্শণী ঃ

প্রযুক্তি প্রদর্শণী সম্প্রসারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। সুনির্দিষ্ট প্রযুক্তি বা কৌশল ব্যবহারের ফলে কৃষকের খামারে উৎপাদনের উপর যে প্রভাব পড়ে তা প্রদর্শন করাই প্রযুক্তি প্রদর্শণীর মূল লক্ষ্য। নতুন প্রযুক্তি হস্তান্তরে খামারিদের আগ্রহ সৃষ্টি ও তা প্রয়োগে বাস্তব ধারণা দেয়ার জন্য কার্যকর মাধ্যম হচ্ছে প্রযুক্তি প্রদর্শণী। নতুন প্রযুক্তি হস্তান্তরের পূর্বে উক্ত প্রযুক্তি স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কি না এবং প্রযুক্তিটি কৃষকের চাহিদার ভিত্তিতে করা হয়েছে কি না এ সব যাচাই বাছাই করে প্রযুক্তি নির্ধারণ করতে হবে। তাহলে খামারি গ্রুপ/খামারি সংগঠন এর মাধ্যমে উক্ত প্রযুক্তি হস্তান্তরের সফলতা পাওয়া যাবে। খামারিদের নিকট প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি হস্তান্তরে প্রদর্শণীর সুবিধা হচ্ছে ঃ

১. খামারিদের লেখাপড়া কম জানা থাকলেও, প্রদর্শণীর মাধ্যমে তাঁদের বুঝাতে অত্যন্ত ফলপ্রসু হয়।

২. খামারি প্রযুক্তি দেখে ও নিজ হাতে করে সহজেই তা শিখতে পারেন এবং অতি সহজেই ভালভাবে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হন।

৩. এর ফলে খামারি ও সম্প্রসারণ কর্মীর মধ্যে বিশ্বাসের স্তর বেড়ে যায় এবং সম্পর্ক সৃষ্টিতে সহায়ক হয়।

৪. অন্যদিকে খামারি সমাবেশ ও মাঠ দিবস কার্যক্রমে প্রদর্শণী সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

প্রযুক্তি প্রদর্শণী সাধারণত দুই প্রকারের, যথা- (ক) ফলাফল প্রদর্শণী ও (খ) পদ্ধতি প্রদর্শণী

(ক) ফলাফল প্রদর্শণী ঃ

যখন কোন উপকরণ ব্যবহার বা কোন কৌশল প্রয়োগের ফলে উৎপাদনের উপর এর প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা হয় তাকে ফলাফল প্রদর্শণী বলা হয়। ফলাফল প্রদর্শণীতে কি ধরণের প্রযুক্তি, কি পরিমান উপকরণ, কখন, কিভাবে ও কি পদ্ধতি প্রভৃতি অনুসরণ করতে হবে এবং এখানে উৎপাদনের অন্যান্য বিষয়াদিও প্রদর্শণ করা হয়। যেমন- একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একটি গরুকে ইউএমএস খাওয়ানোর ফলে গরুর যে ওজন বৃদ্ধি হয় তা এ প্রযুক্তির ফলাফল। ফলাফল প্রদর্শণীর ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমানটি তুলনা করার জন্য ১টি নিয়ন্ত্রণ খামার বা প্লট বা কার্যক্রম অথবা খামারের পূর্ব উৎপাদন লিপিবদ্ধ করতে হয়। খামারি/কৃষকের সমস্যা ও চাহিদার ওপর নির্ভর করে এ ধরনের ফলাফল প্রদর্শণী করা হলে খামারী/কৃষকগণ উৎসাহিত হবে।

(খ) পদ্ধতি প্রদর্শণী ঃ

যখন সম্প্রসারণ কর্মীদের মাধ্যমে কোন প্রযুক্তি বা কৌশল এক বা একাধিক খামারিকে হাতে কলমে শেখানো/দেখানো হয় তাকে পদ্ধতি প্রদর্শণী বলা হয়। পদ্ধতি প্রদর্শণী একটি দলীয় (গ্রুপ) সম্প্রসারণ পদ্ধতি, যা এক হতে দু-ঘন্টা স্থায়ী হতে পারে। তবে পদ্ধতি প্রদর্শণীর বিষয়ে কৃষক/খামারিদের চাহিদা বা সমস্যার ভিত্তিতে চিহ্নিত করতে হবে। এ পদ্ধতিতে একটি বিশেষ দক্ষতা ধাপে ধাপে প্রদর্শন করে এবং অংশগ্রহণকারীদের অনুশীলন করতে সাহায্য করে, যেমন UMS প্রস্তুতকরণ। এ পদ্ধতিটি অংশগ্রহণমূলক এবং কৃষক/খামারিগণ UMS প্রস্তুতকরণ প্রযুক্তি পদ্ধতিটি এক হতে দু-ঘন্টার মধ্যে হাতে-কলমে শিখতে সমর্থ হয়। পদ্ধতি প্রদর্শণীর ক্ষেত্রে বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী উৎপাদন খরচ ও আয়ের ১টি হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রযুক্তি প্রদর্শণী পরিকল্পনা প্রণয়ন ঃ

প্রযুক্তি প্রদর্শণীর জন্য বাৎসরিক ভিত্তিতে পরিকল্পনা করা প্রয়োজন যাতে ঐ বছরের মধ্যেই প্রদর্শণীর ফলাফল পাওয়া যায় বা প্রদর্শণী সম্পর্কিত কার্যক্রম শেষ করা যায়। উল্লেখ্য এ পরিকল্পনায় কোনটি সবচেয়ে উপযোগী প্রদর্শণী তা যাচাই করে নির্বাচন করতে হবে। তারপর প্রদর্শণীর সময়সূচি ঠিক করতে হবে। ফলাফল প্রদর্শণী পরিকল্পনায় নিম্ন বর্ণিত বিষয়াদির সমন্বয় করা যায়ঃ- ● পরিকল্পনার সুষ্ঠু ব্যবহার ● প্রদর্শণীর স্থান নির্বাচন ● প্রয়োজনীয় উপকণের পরিকল্পনা ● কৃষক/খামারি এর জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ/ব্রিফিং।

সম্প্রসারণ পরিকল্পনাঃ

সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়নকালে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে কী প্রদর্শণী হবে এবং কখন করা হবে। সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় কোনটি সবচেয়ে উপযোগী প্রদর্শণী তা যাচাই করে নির্বাচন করতে হবে। তারপর প্রদর্শনীর সময়সূচি ঠিক করতে হবে এবং সে অনুযায়ী পরিকল্পনার কার্যক্রম সুষ্ঠু ব্যবহার করতে হবে।

প্রদর্শণী খামার/জমি নির্বাচন এর বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

১. **প্রদর্শণীর স্থান নির্বাচন ঃ**

- প্রদর্শণীর স্থান সহজে দৃশ্যমান এবং সহজে যাওয়া যায় এমন খামার/কৃষক এর বাড়িতে/প্লটে হওয়া উচিত।
- প্রদর্শণীর জন্য নির্বাচিত খামারি/কৃষককে প্রাডিউসার অর্গানাজেশনেরসদস্যের অন্তর্ভূক্ত হতে হবে, যারা মূলত সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে চাহিদা বা সমস্যা চিহ্নিত করেছেন এবং প্রদর্শণী থেকে উক্ত সমস্যা সমাধানে আগ্রহী।
- যদি একক খামারি প্রদর্শণী হয় তাহলে এমনভাবে খামার নির্বাচিত করতে হবে যেন তাতে খামারি গ্রুপের সকল সদস্যের সম্মতি থাকে।

২. খামার নির্বাচন ঃ (গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ, গাভী পালন, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগি পালন ইত্যাদি)

- খামারটি সুবিধাজনক ও পরিমানমত জায়গায় হতে হবে। খামারটি খোলামেলা জায়গায় হতে হবে যেখানে রৌদ্র ও আলো বাতাস চলাচল করতে পারে। খামারটি পরিদর্শনের জন্য যাতায়াতের সুবিধা থাকতে হবে।
- খামারে বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ এবং বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- মুরগি খামারের ক্ষেত্রে বাহির হতে যাতে কোন প্রাণি খামারে প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- হাঁস পালনের ক্ষেত্রে খামারের নিকট পুকুর/জলাশয় থাকতে হবে।

৩. ঘাস চাষ প্রদর্শণী ঃ

- ঘাস চাষ প্রদর্শণী মূলত কৃষকের নির্ধারিত প্লটে করা হয়।
- ঘাস চাষের জমিটি কাঙ্খিত আকার ও আকৃতির হতে হবে।
- ঘাস চাষের জমিটি খোলামেলা স্থানে হতে হবে যাতে রৌদ্র ও আলো বাতাস চলাচল করতে পারে।
- ঘাস চাষের জমির মাটির ধরণ ঘাস চাষের উপযোগী থাকতে হবে।
- ঘাস চাষের জমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ঘাস চাষের জমিটি দৃশ্যমান ও পরিদর্শনের জন্য যাতায়াতের সুবিধা থাকতে হবে।
- প্রদর্শণীর ঘাস কাটিং পর্যায়ে এলে খামারি/কৃষকদের নিয়ে মাঠ দিবস করতে হবে। মাঠ দিবস করার সময় মাঠদিবস এর সকল নিয়ম যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

প্রদর্শণী বাস্তবায়নকারী কৃষক গ্রুপের সদস্য নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় সমূহ ঃ

- অবশ্যই সক্রিয় সদস্য হতে হবে।
- প্রদর্শণী কার্যক্রম বাস্তবায়নে সদস্যের আগ্রহ থাকতে হবে।
- প্রদর্শণী কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় খামার/জমি থাকতে হবে।
- সদস্যের প্রাণিসম্পদ বিষয়ক মূখ্য পেশা হতে হবে।
- অন্যান্য সদস্য খামারিদের মধ্যে তার বাস্তবায়িত প্রযুক্তির জ্ঞান বিনিময়/ছড়িয়ে দেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রদর্শণীর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের পরিকল্পনা ঃ

- প্রদর্শণীতে প্রাণির সংখ্যা/প্লটের আকার ও প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় উপকরণের পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।
- প্রদর্শণী স্থানে একটি সাইন বোর্ড দিতে হবে, যেখানে সমিতির নাম, প্রযুক্তির নাম/বিবরণ, প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ও প্রদর্শণী শুরুর তারিখ ইত্যাদি থাকবে।

প্রদর্শণীর জন্য সংক্ষিপ্ত কৃষক/খামারি প্রশিক্ষণ/ব্রিফিং ঃ

প্রদর্শণী প্রতিষ্ঠার পূর্বে প্রদর্শণীর উদ্দেশ্য, প্রদর্শণী থেকে কী অর্জন করতে চাওয়া হচ্ছে এবং কীভাবে তা বাস্তবায়িত হবে তা প্রদর্শণী পরিচালনাকারী খামারীদের পরিষ্কার ভাবে বুঝতে হবে। তাই এ সম্পর্কে প্রদর্শণী পরিচালনাকারী খামারী/কৃষককে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ/ব্রিফিং দিতে হবে। এটা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা একই ধরণের প্রদর্শণী বাস্তবায়নকারী সকল খামারীকে একটি অধিবেশনে ঐ প্রদর্শণী সম্পর্কে অবহিত করতে পারেন। তবে উক্ত প্রযুক্তি এবং প্রদর্শণী বাস্তবায়ন বিষয়ক একটি বর্ণনামূলক লিফলেট খামারিকে সরবরাহ করতে পারলে ভাল হবে।

প্রদর্শণী বাস্তবায়ন ঃ প্রদর্শণীর সফল বাস্তবায়নের জন্য জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন-

- প্রদর্শণী প্রতিষ্ঠার পূর্বে প্রশিক্ষণ/সংক্ষিপ্ত ব্রিফিং এর দিনেই কৃষক/খামারিকে উক্ত প্রদর্শণীর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করতে হবে।
- প্রদর্শণী প্লট নিয়মিত পরিদর্শন ও প্রদর্শণী পরিচালনাকারী কৃষক/খামারির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে।

- প্রত্যেকটি প্রদর্শণীর জন্য একটি রেজিষ্টার সংরক্ষণ করতে হবে, যেখানে প্রদর্শণীর বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সব ধরণের তথ্য যথা প্রয়োগের তারিখ, প্রয়োগ পদ্ধতি, উপকরণ, সমস্যা ও উত্তরণের উপায়, ফলাফল, আয়-ব্যয়, প্রদর্শণী পরিদর্শনকারীর পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- প্রদর্শণী খামার/প্লট নিয়মিত পরিদর্শন ও প্রদর্শণী পরিচালনাকারী খামারির সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে।
- প্রদর্শণী স্থানে মাঠ দিবস ও অন্যান্য সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
- প্রতিটি প্রদর্শণীর ছবি তুলে রাখতে হবে। ছবির নিচে উক্ত প্রদর্শণীর তারিখ, স্থান উল্লেখ পূর্বক ছবিটি উপজেলায় সংরক্ষণসহ ডিএলএস এর ই-মেইলে পাঠাতে হবে।
- প্রদর্শণী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করতে হবে।

প্রযুক্তি প্রণয়নকালে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে কী প্রদর্শণী হবে এবং কখন করা হবে। এ পরিকল্পনায় কোনটি সবচেয়ে উপযোগী প্রদর্শণী তা যাচাই করে নির্বাচন করতে হবে। তারপর প্রদর্শণীর সময়সূচি ঠিক করতে হবে।

প্রযুক্তি প্রদর্শণীর সাইন বোর্ড যেভাবে প্রস্তুত করতে হবে-

................প্রদর্শণী

খামারি সংগঠনের নাম	ঃ	
খামারি/কৃষকের নাম	ঃ	
প্রযুক্তির নাম	ঃ	
কার্যক্রম শুরুর তারিখ	ঃ	

বাস্তবায়নে ঃ উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর,----------,----------
এলডিডিপি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।

- ❑ প্রতিটি প্রযুক্তি প্রদর্শণীতে একটি করে প্রদর্শণীর সাইনবোর্ড থাকবে ।প্রযুক্তি প্রদর্শণীর সাইবোর্ডের মাপ হবে ঃ ৩ ফিট X ২ ফিট ।
- ❑ প্রকল্প এলাকায় প্রযুক্তি প্রদর্শণীর সকল সাইন বোর্ড এর রং ও ডিজাইন একই প্রকার করতে হবে। তাই একই প্রকার সাইন বোর্ড করার জন্য অত্র প্রকল্পের ওয়েব সাইটে “প্রযুক্তি প্রদর্শণীর সাইবোর্ডের নমুনা” প্রদর্শণ করা আছে।

সেশন-৬

কৃষক মাঠ স্কুল, কৃষক মাঠ দিবস ও কৃষক সমাবেশ

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- কৃষক মাঠ স্কুল সম্পর্কে ধারণা ও উদ্দেশ্য
- কৃষক মাঠ স্কুলের মূলনীতি
- কৃষক মাঠ দিবস সর্ম্পকে ধারনা ও ব্যবস্থাপনা
- কৃষক সমাবেশ সম্পর্কে ধারণা ও পরিকল্পনা

কৃষক মাঠ স্কুল (Farmers Field School Concept) ধারণা ঃ

কৃষক মাঠ স্কুল একটি অংশগ্রহণমূলক অনানুষ্ঠানিক কৃষক শিখন প্রক্রিয়া যা বয়স্ক শিক্ষার নীতিমালা অনুসরণ করে থাকে। যেখানে কৃষক নিজেরাই পরস্পরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে খামারের সমস্যা চিহ্নিত করে এবং তার কারণ ও সম্ভাব্য সমাধান তৈরি করতে পারে। ফসল/গবাদিপশু-হাঁসমুরগির উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিয়মিত শিখন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে একদল কৃষক-কৃষানী তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। প্রাথমিকভাবে একজন সহায়ক এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে প্রক্রিয়াটি শুরু ও চলমান করার জন্য সহায়তা করবে এবং সবার অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। ফলত: এটি সবার শেখার সুযোগ সৃষ্টি করে। সামগ্রিকভাবে শিখন প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো খামারের উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কৃষক-কৃষানীদের ক্ষমতায়ণ করা।

জানা যায় যে, নব্বই দশকে ইন্দোনেশিয়াতে কৃষক মাঠ স্কুল কার্যক্রম শুরু হয়। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর সহায়তায় ইন্দোনেশিয়ার কৃষি বিভাগ সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির আওতায় ধান চাষী কৃষকদের মধ্যে কৃষক মাঠ স্কুল প্রথমত: চালু করে। কেয়ার বাংলাদেশের ANR Sector এর INTERFISH এবং NOPEST প্রকল্প প্রথমে FFS বিষয়টি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে। পরবর্তীতে ANR Sector এবং Homestead Program এর অন্যান্য প্রকল্পে এই FFS প্রক্রিয়া চালু করেছে। FFS প্রক্রিয়াটি এখন ধানের মাঠ থেকে সবজি ও গাছ-পালা, মাছ চাষ, হাঁস-মুরগী ও গবাদিপশুর ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হয়েছে। অনেক দেশেই কৃষক মাঠ স্কুল শিখন প্রক্রিয়া থেকে অন্যান্য শিক্ষা-সম্প্রসারণ কৌশলের উদ্ভাবন হয়েছে। যেমন ঃ কৃষক থেকে কৃষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, কৃষক পরিচালিত গবেষণা এবং কৃষক স্বার্থ সংরক্ষণ কমিটি ও সংগঠন ইত্যাদি।

কৃষক মাঠ স্কুলের উদ্দেশ্য ঃ

- ফসল, ক্ষেত, খামার ও পুকুর এর প্রতিবেশ (ecosystem) সর্ম্পকে কৃষকদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা।
- খামার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কৃষকদের পর্যবেক্ষণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা উন্নয়ন করা।
- ফসল/খামার ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে নতুন/সৃজনশীল চিন্তা করা ও তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কৃষকদের ক্ষমতার উন্নয়ন করা।
- কৃষক থেকে কৃষক সম্প্রসারণের কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান/দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- কৃষকদের নিজেদের ভেতর দলীয় মনোভাব সৃষ্টি করা যাতে তারা ভবিষ্যতে নিজেদের এবং সমাজের অন্যান্য কৃষকদের ফসল ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করতে পারে।
- কৃষকদের বাজার ব্যবস্থাপনা ও নেটওয়ার্কিং সম্বন্ধে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- কৃষকদেরকে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করা যাতে কৃষক তা নিজ মাঠে অনুশীলন করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে।
- কৃষকদের নতুন সমস্যা বিশ্লেষণ করা- সমস্যা সমাধানের উপায় বের করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শেখানো।

কৃষক মাঠ স্কুলের মূলনীতি ঃ

● হাতে কলমে শিখন ● কৃষকের খামার বা মাঠ হল শিখন স্থান ● শিখন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণমূলক সহায়তা দান ● গবেষণা উদ্ভুত শিখন প্রক্রিয়া ● নির্দিষ্ট পাঠক্রম ● খামার ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষণ ● অংশগ্রহণমূলক মনিটরিং ও মূল্যায়ন

কৃষক মাঠ স্কুল একটি শিক্ষণ প্রক্রিয়া যেখানে ঃ

- কৃষককের অর্জিত জ্ঞানকে স্বীকৃতি দেয়া হয়ে থাকে।
- এটি অ-প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে এমন পরিবেশ তৈরি করা হয় যাতে কৃষকেরা নিজের মাঠে করে বাস্তব জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে শিখতে পারে।
- কৃষক মাঠ স্কুল এক কথায় বুঝায় নিজে করে ও বুঝে শেখা ।
- কৃষক মাঠ স্কুল কৃষকদেরকে নিজে করে শেখানোর মাধ্যমে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা।
- এই শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি পরিবেশ তৈরি করা হয় যাতে কৃষকেরা নিজেদের অভিজ্ঞতা পরস্পরের সাথে বিনিময় করতে পারে, একে অপরের কাছ থেকে শিখতে পারে এবং এর মাধ্যমে বর্তমান উৎপাদন কৌশলে পরিবর্তন এনে একটি স্থায়িত্বশীল কৃষি উৎপাদন দিকে যেতে পারে।
- কৃষকদেরকে এমন পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া হয় যাতে উৎপাদনের জন্য নতুন কৌশল অবলম্বন করতে পারে ।
- কৃষক মাঠ স্কুল একদল কৃষক নিয়ে পরিচালিত হয়, এটি একটি স্কুল যার জন্য কোন দেয়াল থাকবে না।
- স্কুলটি মৌসুমভিত্তিক হয়ে থাকে। যেখানে কৃষকেরা নতুন কৌশল মাঠে অনুশীলন করবে।

কৃষক মাঠ দিবস ব্যবস্থাপনা ঃ

মাঠ দিবস একটি দলীয় সম্প্রসারণ (Group Extension) পদ্ধতি যা ফলাফল প্রদর্শণী স্থানে পরিচালিত হয়। একক খামারীর ফলাফল প্রদর্শণীর ক্ষেত্রে মাঠ দিবস ব্যয় সাশ্রয়ী ও খুব গুরুত্বপূর্ণ। মাঠ দিবসে অধিক সংখ্যক কৃষককে প্রদর্শণী স্থান পরিদর্শনে কী প্রযুক্তি প্রদর্শণী হচ্ছে তা শিখতে, সে সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে এবং নতুন প্রযুক্তি নিজের খামারে পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ করে দেবে।

সাধারণত নতুন প্রযুক্তি গ্রহনে কৃষক/খামারীদের উৎসাহ এবং উদ্বুদ্ধ করার নিমিত্তে প্রযুক্তি প্রদর্শণীর ফলাফল প্রাপ্তির দিনে অধিক সংখ্যক কৃষক/খামারীদের সমাবেশের মাধ্যমে মাঠ দিবস সংগঠিত করা হয়। এই দিন নতুন প্রযুক্তির জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি অবহিত ও প্রদর্শণী প্রযুক্তি গ্রহনের আগ্রহ নিয়ে সদস্য কৃষক/খামারীগণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

প্রাণিসম্পদের ক্ষেত্রে মাঠ দিবসে ঘাস চাষ/প্রাণিপালন পদ্ধতি, উপকরণ ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন সময়কালে গৃহীত প্রক্রিয়া এবং শেষ পর্যায়ে উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দেয়া হয়। এই অনুষ্ঠান প্রাণিসম্পদের তথ্য প্রচারের জন্য একটি ভাল উৎস, কারণ এই দিন সংশ্লিষ্ঠ বিষয়ে স্থানিয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, জনপ্রতিনিধি এবং অতিথিবৃন্দকে সমাবেশে কিছু বলার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। মাঠ দিবসের আয়োজনে নিম্ন বর্ণিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করা প্রয়োজন :

মাঠ দিবস পরিচালনা করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন ঃ

- মাঠ দিবসের তারিখ এবং সময় আগেই ঠিক করতে হবে এবং প্রতিবেশী কৃষকদের জানাতে হয়।
- প্রদর্শণী পরিচালনাকারী কৃষকদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে উপযুক্ত তারিখ ও সময় নির্ধারণ করা।
- মাঠ দিবসের দিন প্রয়োজন হতে পারে এমন সব সামগ্রী সংগ্রহ করা।
- প্রতিবেশী কৃষক ও পূর্বে অংশগ্রহণ করেছেন এমন কৃষককে মাঠ দিবসের বিষয় জানানো, যেখানে সম্ভব একই আর্থ-সামাজিক পরিপার্শ্বিকতা হতে খামারীদের আনা উচিত।
- অংশগ্রহণকারী খামারীদের সংখ্যা ৩০-৩৫ জনের বেশি হওয়া উচিত নয়। কেননা কৃষকদের ছোট দল হলে তাঁরা ভালভাবে দেখার এবং খামারী ও সম্প্রসারণ কর্মীর নিকট হতে ব্যাখ্যা শোনার সুযোগ বেশি পাবে।
- প্রদর্শণী পরিচালনাকারী খামারী যেন সঠিকভাবে প্রদর্শণীর উদ্দেশ্য, কি করা হয়েছে, প্রত্যাশিত লাভ, খরচ ও উৎপাদন

ব্যাখ্যা করতে পারেন সে ব্যাপারে নিশ্চিত করা।

- এমন একটি আনুষ্ঠানিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেখানে খামারিগণ প্রশ্ন করতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন এবং প্রযুক্তি সম্বন্ধে খোলামেলা আলাপ করতে পারে।
- উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা/প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, লাইভস্টক ফিল্ড এসিসটেন্ট খামারিদের সাথে অনানুষ্ঠানিক আলাপের মাধ্যমে জেনে নেবেন যে তাঁরা প্রদর্শণীর বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভালভাবে বুঝতে পেরেছেন কিনা, প্রযুক্তি সম্পর্কে তাদের মনোভাব এবং তারা প্রযুক্তি নিজের খামারে প্রয়োগ করে দেখবেন কিনা?

মাঠ দিবস সফলভাবে বাস্তবায়ন ঃ
মাঠ দিবসের দিন সম্প্রসারণ কর্মীদের আগেই প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী নিয়ে মাঠে/প্রদর্শীত স্থানে উপস্থিত হয়ে সবকিছু ঠিকমত আছে কিনা নিশ্চিত হতে হবে। মাঠ দিবস সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন ঃ

- মাঠ দিবসে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে লোকজন প্রশ্ন করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।
- প্রদর্শণী পরিচালনাকারীকে প্রদর্শণীর উদ্দেশ্য, প্রদর্শণীতে কী করা হয়েছে এবং প্রযুক্তির উপকারিতা ও খরচ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব উপস্থিত কৃষক/খামারিকে জানাতে উৎসাহিত করতে হবে।
- উপস্থিত কৃষকেরা যাতে প্রদর্শণীর চারপাশ ঘুরে প্রযুক্তির বিষয়ে জানতে পারেন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি নিশ্চিত হতে পারেন সে জন্য প্রদর্শণীর নিকটে নিয়ন্ত্রণ প্রাণি/প্লট থাকতে হবে। তা হলে দুটির মধ্যে পার্থক্য দেখতে খামারি/কৃষকেরা উৎসাহিত হবেন।
- অংশগ্রহণকারী কৃষকদের নাম, এনআইডি, মোবাইল নম্বর লিখে রাখতে হবে।
- প্রতিটি মাঠ দিবসের ছবি তুলে রাখতে হবে। ছবির নিচে উক্ত পদ্ধতি প্রদর্শণীর তারিখ, স্থান উল্লেখ পূর্বক ছবিটি উপজেলায় সংরক্ষণসহ এলডিডিপি পিএমইউ এর ই-মেইলে পাঠাতে হবে।

খামারি/কৃষক সমাবেশ ঃ
খামারি/কৃষক সমাবেশ হচ্ছে বড় ধরনের সম্প্রসারণ অনুষ্ঠান যার মাধ্যমে একটি মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে সমন্বিত সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এগুলো সফল প্রযুক্তি প্রবর্তন ও প্রাণিসম্পদের বিভিন্ন সমাবেশকে (Campaign) কেন্দ্র করে ব্যবহার করা উচিত। এলডিডিপির এর আওতায় প্রকল্পাধীন প্রতি ইউনিয়নে এ ধরণের সমাবেশের ব্যবস্থা রয়েছে।

খামারি/কৃষক সমাবেশ পরিকল্পনা ঃ
খামারী/কৃষক সমাবেশ বড় মাঠ দিবসের মতো বাইরে আয়োজন করা হয়। কারণ এটি অনেক কার্যক্রমের সমন্বয়ে একটি একক অনুষ্ঠান। তাই সাবধানে পরিকল্পনা করা দরকার। এটা অবশ্য অন্যান্য সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারীদের অংশীদারিত্ব নেয়ার সুযোগ করে দেবে।
কৃষক/খামারিদের সফল সমাবেশের পরিকল্পনা করার জন্য কিছু ধারণা নিচে দেয়া হলো -

- খামারি/কৃষক সমাবেশের ব্যাপারে একটি কর্মসূচি নেয়া যেখানে- উদ্বুদ্ধকরণ, উপস্থাপন, লোকজ সঙ্গীত, অংশগ্রহণকারীদের উপস্থাপন, লোকজ নাটক, পুরষ্কার বিতরণ ইত্যাদি বিষয় থাকতে পারে।
- উক্ত সমাবেশের সহায়ক সামগ্রী তৈরি করা যেমন- ব্যানার, লিফলেট, পোষ্টার ইত্যাদি।
- সমাবেশ অনুষ্ঠানের স্থান এমন হওয়া উচিত যাতে সেখানে অনেক লোকের বসার জায়গা থাকে এবং অনুষ্ঠানের স্থান সকল কৃষকের নিকট সহজে যাতায়াত উপযোগী হয়।
- সমাবেশের তারিখ ও অনুষ্ঠানের স্থান নির্বাচন করা হলে তা প্রচার করা উচিত। এ জন্য পোস্টার তৈরি ও বিতরণ করা যেতে পারে, কৃষক গ্রুপকে এ সমাবেশে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করা যেতে পারে।
- সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পার্টনার সংস্থাগুলোকে জড়িত করা উচিত, এটা অভিজ্ঞতা ও সম্পদ ভাগ করে ব্যবহার করার সুযোগ করে দেবে।

সেশন-৭

অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা (PRA) পদ্ধতির ব্যবহার

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- পিআরএ (PRA) সর্ম্পকে ধারণা
- পিআরএ এর সুবিধাদি
- পিআরএ তৈরী কৌশল

পিআরএ (PRA) কী ?

P= (Participatory) অংশগ্রহণমূলক: তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ- এটি একটি বটম আপ এপ্রোচ যেখানে প্রকল্প জনবলের দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাল যোগাযোগ দক্ষতা প্রয়োজন হয়।

R = (Rural) গ্রামীণ: সমীক্ষার বিভিন্ন কৌশলসমূহ যে কোন অবস্থায় যেমন গ্রাম বা শহরে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত জনগণের সাথে পরিচালনা করা যেতে পারে।

A =(Appraisal) সমীক্ষা: সমীক্ষা হলো গ্রামীণ সমস্যা, চাহিদা ও সম্ভাবনা বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ করার পদ্ধতি।

সুতরাং অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা (Participatory Rural Appraisal বা PRA) হল এমন কতগুলো পদ্ধতির সমষ্টি যা গ্রামের তথা এলাকার মানুষকে তাদের নিজেদের জীবনের ও পরিবেশের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করতে, বহিরাগতদের সংগে মত বিনিময় করতে এবং নিজস্ব সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তদারক ও মূল্যায়ন করতে সামর্থ্য যোগায়। অর্থাৎ PRA-কে প্রায়শ:ই “এক ঝুড়ি কৌশল” হিসেবে অভিহিত করা হয়। এ সকল কৌশল গ্রামবাসীদেরকে বিভিন্ন ডায়াগ্রাম, চার্ট বা মানচিত্র তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ করে যার মাধ্যমে ঐ সকল গ্রামবাসীর অতীত ও বর্তমান অবস্থা প্রতিফলিত হয়।

পিআরএ বলতে গ্রামের বা এলাকার জনগণের দ্বারা তাদের নিজেদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ, চাহিদা নিরূপণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ (মনিটরিং) ও মূল্যায়ন করার পদ্ধতিসমূহের সমষ্টি অর্থাৎ যাদের জন্য প্রকল্প তাদের মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ ও সমাধান নির্ণয় করাকেই পিআরএ বলা হয়।

পিআরএ বনাম অন্যান্য জরিপ ঃ

পিআরএ	যে কোন জরিপ
যে সব উপাত্ত প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হবে কেবল সে সব উপাত্তই সংগৃহীত হয়।	পরে ব্যবহৃত হয় না বা কাজে লাগে না এমন সব উপাত্ত ও সংগৃহীত হয়।
উপাত্তে কোন রকম তথ্য ঘাটতি থাকলে আলোচনা করে তা তাৎক্ষণিকভাবে পূরণ করা সম্ভব।	একবার উপাত্ত সংগ্রহের কাজ সমাপ্ত হয়ে গেলে বাদ পড়া তথ্য বা ভুলভাবে নেওয়া তথ্য সংশোধন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।
দল ও সমাজ কর্তৃক সাবেক ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞানের ভিত্তির ক্রমাগত উন্নয়ন সম্ভব।	পূর্ব নির্ধারিত তথ্য সংগ্রহপত্র (Questionnaire) ব্যবহার করে তা সম্ভবপর হয় না।
‘কেন’ এর ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়।	‘কেন’ এর বদলে ‘কী’ এর ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়।

পিআরএ এর সুবিধাদি ঃ

১) অভীষ্ট দলের জন্য যথার্থ অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ : পিআরএ কৌশল স্থানীয় জনগণকে উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহের অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণ ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়। ফলে উন্নয়ন পরিকল্পনা শুরুতেই স্থানীয়ভাবে অপ্রয়োজনীয় কাজগুলো বাতিল করা যায় ।

২) স্থায়িত্ববোধের সঞ্চার : স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে কোন উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন হয় বিধায় এর সকল দায়িত্ববোধ অংশগ্রহণকারী সকলের মাঝে সঞ্চারিত হয়। ফলে বাস্তবায়ন কার্যকর ও স্থায়িত্বশীল হয়।

৩) স্থানীয় উন্নয়ন কর্মীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও ব্যবহার : পিআরএ'র মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় বিধায় উন্নয়ন কর্ম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় স্থানীয় কর্মী চিহ্নিতকরণ সম্ভব হয়। তাদের কর্মস্পৃহা উজ্জীবিত করা যায় এবং শ্রমের সর্বোচ্চ কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

৪) স্থানীয় জনগণ এবং উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মাঝে অধিকতর কার্যকর যোগাযোগ : উন্নয়নের প্রাথমিক সুফলভোগী স্থানীয় জনগণ এবং উন্নয়ন কর্ম বাস্তবায়নের সহায়তাদানকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে ঘনিষ্টতর এবং কার্যকর যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ফলে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যাবলী পূরণ হয়।

৫) স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার : স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য সম্পদের খোঁজ স্থানীয় লোকেরাই ভাল জানেন। ফলে পিআরএ'র মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদের সন্ধান লাভ ও ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

৬) সামাজিক সম্পদসমূহের ব্যবহার : স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্তকরণ ও স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য অন্যান্য সম্পদ যেমন- অর্থ, সঞ্চয়, সময় ইত্যাদি সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

৭) অধিক স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন কর্মকান্ড : এ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সুদূর প্রসারী পরোক্ষ প্রভাব অন্যত্রও অনুভূত হয়। ফলে বাইরের সাহায্য-সহায়তা ছাড়া কিছু কিছু উন্নয়নমূলক কাজ স্থানীয় জনগণের উদ্যোগেই আরম্ভ হতে পারে।

পিআরএ পদ্ধতি প্রয়োগের মূলভিত্তি ঃ পিআরএ পদ্ধতি প্রয়োগের মূলভিত্তি ৩টি, যথাক্রমে ১. আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি ২.পদ্ধতি ৩. মতবিনিময়। এ তিনটি বিষয়ে কোন প্রকার জটিলতা, ঘাটতি বা সমস্যা থাকলে পিআরএ -এর গুণগত ফলাফল লাভ সম্ভব হবে না। তাই এ তিনটি বিষয়কে পিআরএ এর তিনটি স্তম্ভ বলা হয় (Three pillars of PRA)।

আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি (Behaviour and Attitude) :

আচরণ এমন একটি বিষয় যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা দলের সাথে সর্ম্পক গড়া যায়, আবার ভাঙ্গাও যায়। বহিরাগত ব্যক্তি বা দলের আচরণের ওপর নির্ভর করে, এলাকার জনগণ তার বা তাদের কত ঘনিষ্ট হবে, খোলা মনে ভাব বিনিময় করবে ও তথ্য প্রকাশ করবে। যদি বহিরাগত ব্যক্তি বা দল এলাকায় গিয়ে এমন ভাব দেখায় যে, আমরা অনেক শিক্ষিত-অভিজ্ঞ, আমরা অনেক কিছুই জানি, তা হলে জনগণ তথ্য প্রদানে অনীহা প্রকাশ করবে। তথ্য প্রদানে নিজেদের দুর্বলতা বা অজ্ঞতা প্রকাশ পায় সেই ভয়ে বা লজ্জায় অনেক তথ্য প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করবে না।

পদ্ধতি (Methods) :

যে কোন সমীক্ষা শুরুর পূর্বে পদ্ধতি নির্বাচন অত্যন্ত জরুরী। সঠিক পদ্ধতি নির্বাচনের ওপর নির্ভর করে ফলাফল কতটুকু সঠিক ও সম্পূর্ণ পাওয়া যাবে। অনেক সময় কোন প্রাপ্ত তথ্যকে যাচাই করার জন্য একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। একই বিষয়ে একাধিক পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্বেই ঠিক করতে হবে কোনটির পর কোনটি ব্যবহার করা হবে। কোন পদ্ধতি ব্যবহারের পূর্বে যাচাই করে দেখতে হবে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে জনগণের নিজস্ব কোন পদ্ধতি আছে কিনা। যদি থাকে তা হলে প্রথমেই জনগণের পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত। কিন্তু উক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণকালে যদি কোন জটিলতা বা অসম্পূর্ণতা দেখা যায় তা হলে তা সমাধানের জন্য দল কর্তৃক পদ্ধতি প্রদান করা যেতে পারে। তবে জনগণের নিকট অপরিচিত কোন পদ্ধতি ব্যবহারের পূর্বে ব্যবহারের নিয়ম অবশ্যই জনগণকে পরিস্কারভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে।

মতবিনিময় (Sharing) :

অংশগ্রহণমূলক সমীক্ষায় অভিজ্ঞতা বা মতবিনিময় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খোলামেলা ও সুচিন্তিত মত বিনিময়ের ওপর নির্ভর করে তথ্য বা মতামত কতটুকু সম্পূর্ণ ও সঠিক তা পাওয়া যাবে। একজনের সাথে মত বিনিময়ের পর প্রাপ্ত তথ্য অন্যদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে যাচাই করতে হবে। দলের সাথে আলোচনা বা মতবিনিময় কালে বিভিন্ন বয়স, পেশা, অর্থনৈতিক - সামাজিক শ্রেণি বা গোষ্ঠী, নবীন ও প্রবীণ, পুরুষ ও মহিলার উপস্থিতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তা না হলে শুধু একটি বিশেষ শ্রেণি বা গোষ্ঠীর অথবা নির্দিষ্ট বয়সের, পেশার, পুরুষ বা মহিলার দৃষ্টিভঙ্গি বা মতামত পাওয়া যাবে।

একজন পিআরএ সহায়তাকারীর বৈশিষ্ট -

১. গ্রামবাসীদের প্রতি বিনম্র ও আগ্রহী/উৎসাহী হবেন
২. স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক হবেন
৩. সহায়তাদানে ইচ্ছুক হবেন
৪. সকলের সাথে সরাসরি যোগাযোগে সচেষ্ট থাকবেন
৫. দলের সাথে বসবেন (অর্ধ-বৃত্তাকারে)
৬. একজন অনুঘটক হিসেবে কাজ করবেন
৭. বলার চেয়ে শোনায় বেশি আগ্রহী থাকবেন
৮. অভীষ্ট দলের নিকট শিখতে আগ্রহী হবেন
৯. হাসিমুখে কাজ করবেন
১০. রসিক হবেন
১১. অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন
১২. নিজের মতামত আরোপের চেষ্টা করবেন না
১৩. সঠিক প্রশ্ন সঠিকভাবে করবেন
১৪. বিব্রত করার মত প্রশ্ন করবেন না
১৫. শ্রদ্ধাসহকারে ও বিনীতভাবে প্রশ্ন করবেন
১৬. একবারে কেবল একটি প্রশ্নই করবেন
১৭. প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে জানাবেন
১৮. উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে প্রশ্ন করবেন
১৯. খোলামেলা প্রশ্ন করে প্রয়োজনীয় তথ্য জানবেন
২০. উত্তর সঠিক হলো কিনা তা জানার জন্য সরাসরি প্রশ্ন করবেন
২১. যে কোন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন
২২. অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন।

পিআরএ'র প্রধান কৌশলসমূহ ও ব্যবহার

কৌশলসমূহ	ব্যবহারের উদ্দেশ্য
পরিভ্রমণ (Walk)	গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত হাঁটার মাধ্যমে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ে জানা, স্থানসমূহের ভূমির গঠন, ব্যবহার, উৎপাদন, সমস্যা ইত্যাদি জানা।
সামাজিক মানচিত্রায়ণ (Social Mapping)	সাধারণভাবে গ্রামের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানা
সম্পদ মানচিত্রায়ণ (Resource Mapping)	গ্রামের সম্পদ সম্পর্কে বিশদ ভাবে জানা। যথা-ঘর-বাড়ি, হাট-বাজার, স্কুল-কলেজ, নদী-খাল-পুকুর, ফসলের জমি, বনভূমি ইত্যাদি।
আর্থিক স্বচ্ছলতার স্তর বিন্যাস (Wealth Ranking)	সম্পদের ভিত্তিতে গ্রামের জনগণের অর্থনৈতিক স্তর বিন্যাস (ধনী-গরীব শ্রেণীবিন্যাস) করা।
বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে স্তর বিন্যাস (Matrix Ranking)	বিভিন্ন বিষয়ে তুলনামূলক স্তর বিন্যাসের মাধ্যমে গুরুত্ব বা প্রয়োজীয়তা জানা।
সচলতার চিত্র (Mobility Chart)	বিভিন্ন প্রয়োজনে গ্রামের জনগণের বিভিন্ন স্থান/সংস্থার সাথে যোগাযোগ বিষয়ে জানা।
চাপাতি ডায়াগ্রাম (Venn Diagram)	বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংস্থার সাথে জনগণের সম্পর্ক জানা, এলাকার বিভিন্ন ব্যাক্তির বা সংস্থার প্রভাব জানা।
সমস্যা নিরূপন (Problem Census)	খামারিদের চাহিদার প্রতি সাড়া প্রদানমূলক সম্প্রসারণ কর্মকান্ডের পরিকল্পনা প্রদান করার জন্য খামারিদের তথ্য/চাহিদা সনাক্ত করা।
ঋতুভিত্তিক পার্থক্য (Seasonality Analysis)	ঋতুভিত্তিক উৎপাদন/কাজের পার্থক্য, রোগ, শ্রম চাহিদা, অভাব, ঋণ সুবিধা, সামাজিক কার্যক্রম ইত্যাদি জানা ও বিশ্লেষণ করা।

পিআরএ ব্যবহার ঃ

খামারিদের চাহিদার প্রতি সাড়াদানমূলক সম্প্রসারণ কর্মকান্ডের পরিকল্পণা করার জন্য খামারিদের তথ্য/চাহিদা সনাক্ত করা হয়।

পদ্ধতি ঃ

- মোটামুটি একই ধরনের অবস্থা সম্পন্ন প্রায় ৩০ জন খামারি/কৃষক এর একটি দলের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে।
- আলোচনার জন্য একটি বিষয় ব্যাখ্যা করা যেমন- প্রাণির খাদ্য উৎপাদন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।
- দলটিতে ৫-৬ জনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ করে, তাদেরকে কাগজকলম দিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে তারা যে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হন সেগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করার জন্য বলতে হবে।
- তালিকা করা শেষ হলে ছোট দলগুলো একটি পূর্ণ অধিবেশনে নিজ নিজ তালিকা পেশ করবেন।
- এরপর সমস্যার একটি বড় তালিকা হবে এবং এ তালিকা হতে সকল দলের জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহ নির্বাচন করতে হবে এবং প্রাপ্ত সমস্যার একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।
- সমস্যাগুলো সমাধানের কোন চেষ্টা করা হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে খামারিদের নিকট হতে জানতে হবে। সে সময়ে তারা কী অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- সহায়তাকারী টীমের সদস্য বা সদস্যবৃন্দ কর্তৃক ডাইরিতে আলোচনার সারমর্ম লিখতে হবে।

পিআরএ এর প্রতিবেদন প্রণয়ন ছক ঃ
পিআরএ এর প্রতিবেদন প্রণয়নের নির্দিষ্ট কোন ছক নেই। পিআরএ পরিচালনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সুবিধামত ছক ব্যবহার করে প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে পারে।

উল্লেখ্য, পিআরএ পরিচালনার সময় সহায়তাকারীকে যতদূর সম্ভব প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিতে হবে । প্রয়োজনে কাগজে বিশেষ বিশেষ তথ্যাদি লিখে রাখতে হবে। পিআরএ অধিবেশন শেষে দলের সকলে মিলে সংগৃহীত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে (প্রয়োজনে পুনরায় যাচাই করে) প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ আরম্ভ করতে হবে।

- শিরোনাম (প্রতিবেদনের বিষয়ভিত্তিক নাম)
- পটভূমি ও ভূমিকা
- উদ্দেশ্য

প্রক্রিয়া/পদ্ধতি (গ্রামের নাম, পিআরএ পরিচালনার স্থান, সময়কাল, তারিখ, অংশগ্রহণকারী, সহায়তাকারী দল, পিআরএ কৌশলের নাম ও বিবরণ)

- ফলাফল

প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিগত, এবং প্রাপ্ত তথ্যভিত্তিক

- ফলাফল ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ (পিআরএ পরিচালনার উদ্দেশ্য এবং প্রাণিসম্পদ পালন কার্যক্রমের সাথে সম্পর্ক রেখে)
- সুপারিশমালা।

সেশন-৮

গবাদিপশুর সুষম রেশন তৈরি ও গাভীর খাদ্য ব্যবস্থাপনা

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- গবাদিপশুর সুষম খাদ্যের গুরুত্ব
- পশুখাদ্যের শ্রেণী বিভাগ
- গবাদিপশুর আদর্শ রেশন তৈরি পদ্ধতি
- গাভীর সুষম খাদ্য তৈরী
- গবাদিপশুর দানাদার ও আশঁ জাতীয় খাদ্য উপকরন

সুষম খাদ্য (Balanced Diet) ঃ সুষম খাদ্য বলতে আমরা ঐ খাদ্যকে বুঝি যাতে দেহের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সঠিক অনুপাতে বিদ্যমান থাকে। দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও উৎপাদনের জন্য সুষম খাদ্য অপরিহার্য।

সুষম পশুখাদ্য নিম্নোক্ত কারণে গুরুত্বপূর্ণ-

- **স্বাস্থ্য সংরক্ষণ (Maintenance) ঃ** পশুর দেহের তাপ সংরক্ষণ, শক্তি উৎপাদন, ক্ষয়পূরণ, রোগ প্রতিরোধ ও সর্বোপরি জীবন ধারণের জন্য খাদ্য অপরিহার্য।
- **দৈহিক বৃদ্ধিসাধন (Growth) ঃ** বাড়ন্ত পশুর সুষ্ঠুভাবে দৈহিক বৃদ্ধির জন্য খাদ্য আবশ্যক।
- **বাচ্চা উৎপাদন (Reproduction) ঃ** পশু সময়মত গরম হওয়া, গর্ভধারণ, বাচ্চা প্রসব তথা পশুর উর্বরতা রক্ষার জন্য সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। এছাড়া গর্ভবতী পশুর গর্ভস্থ বাচ্চার দৈহিক বৃদ্ধির জন্য সুষম খাদ্যের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ।
- **দুধ উৎপাদন (Milk Production) ঃ** পশুর দুধ উৎপাদনের পরিমাণের উপর পশুখাদ্যের উপাদান ও পরিমাণ বৃদ্ধি আবশ্যক। অর্থাৎ গাভীকে খাদ্য সরবরাহের উপর তার পরিমাণ ও মান নির্ভর করে।
- **প্রাত্যহিক কর্মক্ষমতা (Daily Work) ঃ** পশুর কাজের ধরন ও পরিশ্রমের উপর পশুখাদ্য সরবরাহ প্রয়োজন। অর্থাৎ পশু শক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যের দরকার পড়ে।
- **মাংস ও উল উৎপাদন (Meat and Wool Production) ঃ** পশুর মাংস ও উল প্রোটিনযুক্ত। তাই উৎকৃষ্টমানের মাংস ও উলের জন্য উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ প্রয়োজন। সুষম পশুখাদ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণে ছয় প্রকার খাদ্য উপাদান থাকে। যথা- (ক) পানি (খ) শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট (গ) আমিষ বা প্রোটিন (ঘ) চর্বি বা স্নেহ পদার্থ (ঙ) খনিজ পদার্থ বা মিনারেলস (চ) খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন ।

রসদ বা রেশন (Ration) ঃ

গবাদিপশুকে দৈনিক অর্থাৎ ২৪ ঘন্টায় যে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য বা খাদ্য সমষ্টি খেতে দেয়া হয় তাকে রসদ বা রেশন বলে। দৈনিক চাহিদা ও উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে পশুখাদ্যকে নিম্নোক্ত কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়-

সুষম খাদ্য (Balanced ration)

যেসব খাদ্য পশু দেহের দৈনিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য উপযুক্ত পরিমাণে ও অনুপাতে সব রকম পুষ্টিকর উপাদান থাকে তাকে সুষম খাদ্য বলে। প্রতিটি পশুর জন্য সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। কারণ সুষম খাদ্যের অভাব হলে পশু তার প্রয়োজন অনুযায়ী পুষ্টিকর উপাদান পায়না ফলে তার দেহ গঠন ও উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়।

১। স্বাস্থ্য রক্ষার খাদ্য (Maintenacne ration) ঃ

পশুর স্বাভাবিক স্বাস্থ্য রক্ষা ও শরীরবৃত্ত (physiology) বিষয়ক কার্যাবলী যথা- শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত সঞ্চালন, পরিপাক ক্রিয়া ইত্যাদি পরিচালনার জন্য শক্তি যোগান দেয় যে খাদ্য তাকে স্বাস্থ্য রক্ষার খাদ্য বলে।

২। উৎপাদক রেশন (Productive Ration) ঃ

পশুস্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যেমন একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন তেমনি তার উৎপাদনের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। আবার উৎপাদনের ধরন ও পরিমাণের উপর খাদ্যের ধরন ও পরিমাণ নির্ভর করে। যেমন- দুগ্ধবতী গাভীর দুধ উৎপাদন, গর্ভবর্তী গাভীর গর্ভস্থ বাচ্চার দৈহিক বাড়ন, বাচ্চা পশুর দৈহিক বৃদ্ধি এবং পশুর লাঙ্গল ও গাড়ি টানা, ভার বহন ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন ধরনের সুনির্দিষ্ট বাড়তি খাদ্যের প্রয়োজন। সুতরাং পশুর স্বাস্থ্য রক্ষার উপযোগী খাদ্য ছাড়াও পশুর উৎপাদনের জন্য অতিরিক্ত যে খাদ্যের প্রয়োজন হয় তাকে উৎপাদক রেশন বলে।

আদর্শ রেশনের বৈশিষ্ট্য ঃ

● রেশন অবশ্যই সুষম হতে হবে ● খাদ্য সহজপাচ্য হওয়া প্রয়োজন ● খাদ্য রেচকগুণ সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।
● সহজলভ্য ও অপেক্ষাকৃত সস্তা হতে হবে ● খাদ্য রুচিকর সুস্বাদু হতে হবে ● খাদ্যে সুঘ্রান যা দুধ উৎপাদনে সহায়ক হয়।
● খাদ্য বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য সমন্বয়ে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গবাদিপশুর সুষম খাদ্য প্রস্তুতের পূর্বশর্ত ঃ গবাদিপশুর খাদ্য যেভাবেই সরবরাহ করা হোক না কেন, সুষম খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য নিম্নোক্ত শর্তগুলো বিবেচনা করা উচিত-

- খাদ্যে পশুর প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সূমহ সঠিক মাত্রায় থাকতে হবে।
- যে সকল উপকরণ স্থানীয় বাজারে সহজে পাওয়া যায় সস্তা খাদ্য তৈরির জন্য সে সব উপকরণ ব্যবহার করা উচিৎ।
- খাদ্য অবশ্যই সু-স্বাদু ও সহজ পাচ্য হতে হবে। বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী দিয়ে খাদ্য তৈরি করা উচিৎ।
- খাদ্য টাটকা হতে হবে। তাছাড়া ময়লা, ছাতাপড়া, দুর্গন্ধ ইত্যাদি মুক্ত হতে হবে।
- দুগ্ধবর্তী গাভীর খাদ্যে পর্যাপ্ত খনিজ পদার্থ থাকতে হবে। খনিজ পদার্থের অভাবে দুধ উৎপাদন হ্রাস পাবে এবং দুগ্ধদান কাল শেষে গাভী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়বে।
- খাদ্য প্রস্তুতের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন পশুর উদর পুর্তি হয়। খাদ্যের আয়তন বেশি হওয়া লাগবে।
- গবাদিপশুর জন্য কাঁচা ঘাস অত্যাবশ্যক। কাঁচা ঘাসে পর্যাপ্ত ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ আছে, তাছাড়া সহজে হজম হয়।
- খাদ্য উপাদান হঠাৎ করে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা উচিৎ নয়, প্রয়োজনে ধীরে ধীরে দিনে দিনে পরিবর্তন করতে হবে।
- খাদ্য অবশ্যই সঠিকভাবে তৈরি করতে হবে। যেমন- ছোলা, খেসারি, মাসকলাই, ভুট্টা, গম, খৈল ইত্যাদি মিশ্রণের পূর্বে ভেঙ্গে নিতে হবে। এর ফলে উপকরণগুলি সুষম ভাবে মিশানো যাবে এবং সহজে হজম হবে।
- ছোবড়া জাতীয় খাদ্য যেমন- খড়, কাঁচা ঘাস ইত্যাদি আস্ত না দিয়ে কেটে ছোট ছোট করে পশুকে খাওয়াতে হবে। এতে যেমন অপচয় কম হবে তেমনি পশুর খেতে সুবিধা হবে এবং হজমে সহায়ক হবে।
- খাদ্য অবশ্যই অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক হতে হবে।

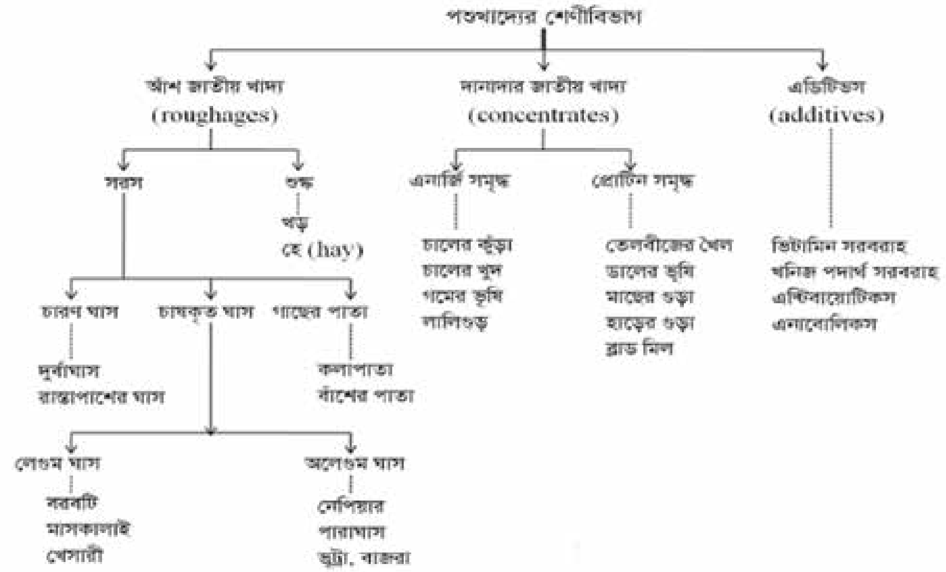

গবাদিপশুর আদর্শ রেশন তৈরি পদ্ধতি ঃ

খাদ্যে শুষ্ক পদার্থের (Dry matter) ভিত্তিতে গবাদিপশুর আদর্শ রেশন তৈরী করা হয়।
গরুর দৈহিক ওজনের ওপর নির্ভর করে ঐ গরুর প্রয়োজনীয় শুষ্ক পদার্থের পরিমান নির্ণয় করা হয়। সাধারণত ১০০ কেজি ওজনের একটি গরুর জন্য ২.০ থেকে ২.৫ কেজি শুষ্ক পদার্থের প্রয়োজন হয়। এ শুষ্ক পদার্থ আঁশযুক্ত এবং দানাদার খাদ্য হতে সরবরাহ করতে হবে। আঁশযুক্ত এবং দানাদার খাদ্য হতে মোট শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ নিম্নরূপ হওয়া প্রয়োজন।

মোট শুষ্ক পদার্থ ঃ

১. ২/৩ আঁশযুক্ত খাদ্য ঃ ক) ২/৩ শুকনো আঁশযুক্ত খাদ্য খ) ১/৩ তাজা আঁশযুক্ত খাদ্য
২. ১/৩ দানাদার খাদ্য
৪০০ কেজি দৈহিক ওজনের একটি গরুর জন্য প্রয়োজনীয় মোট শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ নির্ণয়ের পদ্ধতি নীচে দেখানো হলো।

- গরুর দৈহিক ওজন = ৪০০ কেজি
- মোট শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ = ৪২.৫ = ১০ কেজি @ ২.৫/১০০ কেজি দৈহিক ওজন।
- আঁশযুক্ত খাদ্য হতে শুষ্ক পদার্থ = ১০২/৩ = ৬.৬৬ অর্থাৎ ৬.৭ কেজি।
- দানাদার খাদ্য হতে শুষ্ক পদার্থ = ১০১/৩ = ৩.৩ কেজি

যখন আঁশযুক্ত খাদ্য লেগুম জাতীয় হবে তখন শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ নিম্নরুপ হবে ঃ
- শুষ্ক আঁশযুক্ত খাদ্য হতে = ৬.৬৩/৪ = ৪.৯৫ অর্থাৎ ৪.৯ কেজি।
- তাজা আঁশযুক্ত খাদ্য হতে = ৬.৬১/৪ = ১.৬৫ অর্থাৎ ১.৬ কেজি।

যখন সাধারণ আঁশ জাতীয় খাদ্য হবে তখন নিম্নরুপ হবে
- শুষ্ক আঁশযুক্ত খাদ্য হতে = ৬.৬২/৩ = ৪.৪ কেজি।
- তাজা আঁশযুক্ত খাদ্য হতে = ৬.৬১/৩ = ২.২ কেজি।

৪০০ কেজি দৈহিক ওজনের একটি গরুর জন্য শুষ্ক পদার্থ ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ ঃ

ক্রমিক	খাদ্য উপকরণ	পরিমাণ (কেজি)	শুষ্ক পদার্থ (%)	মোট দেয় শুষ্কপদার্থ (কেজি)
১	খড়	৪.৫	৯০	৪.০৫
২	সবুজ কাঁচা ঘাস	১৭.৫	১৫	২.৬২
	ক) আঁশ জাতীয় খাদ্য =	২২ কেজি	-	৬.৬৭ কেজি
৩	চালের ভূষি/গমের ভূষি	৩.০	৯০	২.৭
৪	তিলের খইল	০.৯	৮৫	০.৮
৫	লবণ	০.১	-	-
	খ) দানাদার খাদ্য =	৪.০ কেজি	-	৩.৫ কেজি
	দৈনিক মোট রেশন	২৬ কেজি	-	১০.১৭ কেজি

গাভীর সুষম খাদ্যঃ
গাভীকে দৈনিক প্রয়োজনীয় অনুপাতে খড়, কাঁচা ঘাস ও দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ সরবরাহ করতে হবে। ৩০০ কেজি ওজনের একটি গাভীকে দৈনিক-
১। উচ্চ মানসম্পন্ন কাঁচা সবুজ ঘাস ঃ দৈনিক ১২-১৫ কেজি

২। শুকনা খড় ঃ দৈনিক ৩-৪ কেজি
৩। ১৮%-২০% প্রোটিন সমৃদ্ধ দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ ২-৩ কেজি সরবরাহ করতে হবে।

গাভীর দানাদার খাদ্য মিশ্রণের তালিকা	
(ক) চালের কুঁড়া	২০ কেজি
(খ) গমের ভূষি	৫০ কেজি
(গ) খেসারি ভাঙ্গা	১৮ কেজি
(ঘ) তিল/বাদাম/সয়াবিন খৈল	১০ কেজি
(ঙ) লবণ	১ কেজি
(চ) খনিজ মিশ্রণ	০.৯ কেজি
ছ) ডিবি ভিটামিন	০.১ কেজি
মোট	**১০০.০০ কেজি**

গাভীকে দানাদার খাদ্য সরবরাহের নিয়ম ঃ

ক) ১০০ কেজি ওজনের গাভীকে প্রতিদিন উপরোক্ত মিশ্রণের ৩ কেজি দানাদার খাদ্য দিতে হবে।
খ) গাভী গর্ভবতী হলে ৫ম মাস থেকে বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত ১.৫ কেজি অতিরিক্ত দানাদার খাদ্য দিতে হবে।
গ) দুধালো হলে প্রতি ২.৫ লিটার দুধের জন্য অতিরিক্ত ১ কেজি হারে দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

৪। পানি ঃ গাভীকে দৈনিক পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি খেতে দিতে হবে (দৈহিক ওজনের ১০-১৫% পানি প্রতিদিন সরবরাহ করতে হবে)।

গবাদিপশুর আঁশ ও দানাদার খাদ্য উপকরন ঃ

কাঁচা ঘাস

খড়

হে

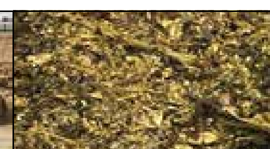
সাইলেজ

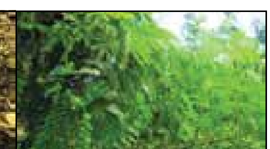
ফডার পাতা(ইপিল-ইপিল)

তিলের খৈল

ভূট্টা ভাঙ্গা

ঝিনুক চূর্ণ

নাড়িকেলের খৈল

রাইস পলিশ

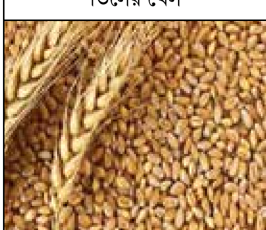
গম ভাঙ্গা

লবণ

সয়ামিল

ঝোলাগুড়

ডিসিপি পাউডার

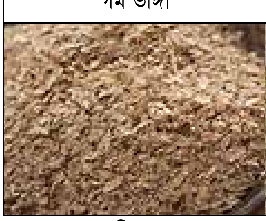
গমের ভূষি

চালের কুড়া

ডাল ভাংগা

ভিটামিন প্রিমিক্স

পানি

সেশন-৯

সবুজ ঘাস সংরক্ষণে সাইলেজ তৈরী ও ব্যবহার

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- সাইলেজ তৈরীর উপযোগী ঘাস
- পিট সাইলেজ তৈরী পদ্ধতি
- পলি ব্যাগ সাইলেজ পদ্ধতি
- সাইলেজ এর উপকারিতা

সবুজ ঘাস সংরক্ষণে সাইলেজ তৈরী পদ্ধতি ঃ

সাইলেজ তৈরীঃ সাধারণভাবে বায়ুরোধক অবস্থায় সংরক্ষিত সবুজ ঘাসকে সাইলেজ বলা হয়ে থাকে। অথবা সাইলেজ হলো গাজনকৃত সবুজ ঘাস। উচ্চ আর্দ্রতাযুক্ত সবুজ ঘাসকে বায়ুহিন পরিবেশ সংরক্ষণ করাহয়। এই প্রক্রিয়াজাত ফডারকে সাইলেজ বলে। বায়ুহিন পরিবেশে পর্যাপ্ত আর্দ্রতাযুক্ত (৬০-৬৫%) ফরেজ বা সবুজ ঘাসকে সংরক্ষণ করলে এতে কিছু রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে এবং এই প্রক্রিয়া বা পরিবর্তন ঘটানোর প্রক্রিয়াকে এনসাইলিং বলে। সাইলেজ তৈরির প্রধান উদ্দেশ্য হলো, যে মৌসুমে সবুজ ঘাসের আধিক্য থাকে, সে মৌসুমে সাইলেজ প্রস্তুত করা এবং সবুজ ঘাসের অভাবের সময় গবাদিপশুকে তা সরবারহ করা।এতে কাঁচা ঘাসের অপচয় কম হয় এবং উহার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। সাইলেজ তৈরির মূলনীতি হলো,যখন উদ্ভিদ কোষ অক্সিজেন বিহীন অবস্থায় ফারমেন্টেটেট হয়, তখন ল্যাকটিক এসিড তৈরী হয়ে থাকে এবং এই ল্যাকটিক এসিড সবুজ ঘাস সংরক্ষনে সহায়তা করে থাকে।

সাইলেজ তৈরীতে উপযোগী ফডার বা ঘাস ঃ

বিভিন্ন ধরনের ঘাস হতে সাইলেজ তৈরি করা হয়ে থাকে। সাইলেজ তৈরি করার জন্য সাধারণত নন-লিগিউম জাতীয় ফডার বা সবুজ ঘাস সবচেয়ে বেশি উপযোগী। যেমন, ওট, ভূট্টা, যোয়ার, নেপিয়ার প্রভৃতি অন্যতম। তবে লিগিউম জাতীয় ফডার দিয়েও সাইলেজ তৈরি করা যেতে পারে। লিগিউম জাতীয় ফডার যেমন বারশিম, লুসার্ণ, কাউপি কিংবা মাটি কালাই দিয়ে সাইলেজ তৈরী করতে হলে বিশেষ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। যেমন বারশিমের সাথে ওট এবং কাউপির এর সাথে ভূট্টা মিশিয়ে অথবা খড় মিশিয়ে সাইলেজ করা হয়। এভাবে সাইলেজ তৈরী করলে লিগুমিনাস ফডারে যে কার্বহাইড্রেট কম থাকে তার অভাব পূরণ করে কার্বহাইড্রেট পরিমান বৃদ্ধি পায় এবং পানির পরিমান কমে আসে। ফলেসাইলেজ ভাল ভাবে সংরক্ষিত হয়ে থাকে এবং খড় ব্যবহার করলে তার পুষ্টিমানও বৃদ্ধি পায়।

আবহাওয়া, খামারের আকার, খামারীর অর্থনৈতিক অবস্থা এবং উপযোগীতার উপর ভিত্তি করে সাইলেজ তৈরীতে বিভিন্ন প্রকার সাইলো পিট ব্যবহার করা হয়।

১। **গ্যাসটাইট সাইলো** ঃ ক) কংক্রিট স্টেভ খ) ইটের স্টেভ

২। **পিট বা গর্ত সাইলো**

৩। **টাওয়ার সাইলো** ঃ ক) কংক্রিট স্টেভ খ) কাঠের স্টেভ গ) ইটের স্টেভ

৪। **সমান্তরাল সাইলো** ঃ ক) ট্রেঞ্চ সাইলো(মাটির গর্ত) খ) বাঙ্কার সাইলো (মাটির উপর)

৫। **স্বল্পস্থায়ী সাইলো** ঃ প্লস্টিক বা পলিথিন ব্যাগ সাইলো

আমাদের দেশের সাধারন খামারী ও কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে,সহজে ও কম খরচে একজন খামারী বা কৃষক যাতে সাইলেজ তৈরি করতে পারে তা সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হলো-

ক) মাটির গর্ত পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতি অনুসরণ করে খামারীরা অতি সহজেই সাইলেজ তৈরী করতে পারেন। এই পদ্ধতিতে প্রচলিত ফডার ছাড়া ও অপ্রচলিত ফডার যেমন মেইজ স্ট্রভার, সুগার কেইন টপ এমনকি প্রাকৃতিক সবুজ ঘাসও সাইলেজ হিসেবে সংরক্ষণ করা যায়। এছাড়া আমাদের দেশে বর্ষা মৌসুমে যে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সবুজ ঘাস পাওয়া যায় তাও এ পদ্ধতি অনুসরণ করে সাইলেজ করা যায়।

মাটির গর্ত বা পিট তৈরী ঃ

একশত ঘনফুট একটি মাটির গর্তে ২.৫-৩.০ টন সবুজ ঘাস সংরক্ষণ করা যায়। সাইলেজের গর্তটি উঁচু জায়গায় হতে হবে,যাতে গর্তের মধ্যে পানি ঢুকতে না পারে। গর্তের গভীরতা ৩ ফুট, প্রস্থ নীচে ৩-৪ ফুট মাঝে ৮ ফুট ও উপরে ১০ ফুট হতে হবে। গর্তের দৈর্ঘ্য সাধারণত: সবুজ ঘাসের পরিমাণের উপর নির্ভর করে থাকে। গর্তের তলায় চার কোনা পাতিলের মত সমভাবে বক্র থাকলে ঘাস চাপানো সহজ হবে।

সাইলেজ তৈরির পদ্ধতি ঃ

যে ঘাসের সাইলেজ প্রস্তুত করা হবে তা প্রথমে টুকরা টুকরা কেটে নিতে হবে। সাইলোতে ঘাস দেওয়ার পূর্বে তলায় পলিথিন অথবা খড় বিছাতে হবে। টুকরা টুকরা করা সবুজ ঘাস সাইলো পিটের মধ্যে স্তরে স্তরে সাজাতে হবে যেন ভিতরে বাতাস না থাকে। ফডার যত বেশী চেপে মাটির গর্তে রাখা যাবে সাইলেজ তত বেশি উন্নত মানের হবে। সাইলেজ মোলাসেস সহ অথবা মোলাসেস ছাড়াও করা যেতে পারে। মোলাসেস ব্যবহার করলে, সবুজ ঘাসের শতকরা ৩-৪ ভাগ চিটাগুড় মেপে একটি চাড়িতে নিতে হবে । তারপর ঘন চিটাগুড়ের মধ্যে ১ ঃ ১ অথবা ৪ ঃ ৩ পরিমাণে পানি মিশালে ইহা ঘাসের উপর ছিটানোর উপযোগী হবে। ঝরনা বা হাত দ্বারা ছিটিয়ে এ মিশ্রণ ঘাসে সমভাবে মিশানো যাবে। প্রতি পরতে ৩০০ কেজি ঘাসের জন্য ৯ থেকে ১২ কেজি চিটাগুড় ও ৯ থেকে ১২ কেজি পানিতে মিশিয়ে উক্ত মিশ্রণ ঝরনা বা হাত দিয়ে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। সবুজ ঘাসের সাথে শুকনো খড় ব্যবহার করলে এক স্তর কাঁচা ঘাস এবং এক স্তর খড় দিতে হবে। উপরের নিয়মে প্রতি ৩০০ কেজি সবুজ ঘাসের সাথে ১৫ কেজি খড় দিতে হবে এবং ঘাস সাজানোর পর মোলাসেস দিতে হবে। খড়ের মধ্যে কোন মোলাসেস বা চিটাগুড় দিতে হবে না। যতটা সম্ভব ভাল ভাবে পা দিয়ে পাড়িয়ে ভাল ভাবে আট সাট করে ভিতরের বাতাস বের করে দিতে হবে। সবুজ ঘাস যত এঁটে সাজানো যাবে সাইলেজ তত মানসম্মত হবে। সাইলো ভর্তি করে মাটির উপরে ৪-৫ ফুট পর্যন্ত ঘাস সাজাতে হবে। সব শেষে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। পলিথিন ঢাকার পর ৩-৪ ইঞ্চি পুরু করে মাটি দিতে হবে যাতে বাতাসে উড়ে না যায় বা অন্য কোন পশু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। এখানে উল্লেখ্য যে সাইলো গর্ত একদিনেই সাজানো ভাল। তবে একদিনে বৃষ্টি অথবা অন্য কোন কারনে সাজানো সম্ভব না হলে প্রতিদিন অল্প অল্প করে ও কয়েকদিন ব্যাপি সাজিয়ে সাইলেজ তৈরি করা যায়।

পলি ব্যাগ সাইলেজ ঃ

মাটির গর্ত ছাড়াও পলিথিন ব্যাগে সাইলেজ তৈরি করা যায়। আমাদের দেশে যে সমস্ত কৃষক ক্ষুদ্র আকারের ডেইরি খামার পরিচালনা করেন তাদের জন্য পলিথিন ব্যাগে সাইলেজ পদ্ধতি খুবই উপযোগী। এই পদ্ধতিতে একজন কৃষক তার প্রয়োজনের তাগিদে ৫০ কেজি থেকে ২০০ কেজি আকারের ব্যাগ সাইলেজ তৈরি করতে পারেন। এ ধরনের ব্যাগ সাইলেজ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অতি সহজেই স্থানান্তর করা যায়। এ পদ্ধতিতে কৃষকের নিজস্ব কোন গবাদিপশু না থাকলেও তিনি তার নিজস্ব জমিতে ঘাস উৎপাদন এবং ব্যাগ সাইলেজ করে বাজারে বিক্রি করতে পারবেন। কেননা ব্যাগ সাইলেজ অতি সহজেই পরিবহন করা যায়।

মাটির গর্তে সাইলেজ তৈরীর যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, ব্যাগ পদ্ধতিতে ঠিক একই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। ব্যাগ পরিপূর্ণ করার পর ভালভাবে মুখ বেধে রাখতে হবে। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউড গবেষণা করে দেখেছেন যে, ব্যাগ পদ্ধতিতে যে কোন ধরনের সবুজ ঘাস এমনকি মেইজ স্টোভার সাইলেজ করে ৬ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখা যায়।

সাইলেজ তৈরীর সময় যে বিষয় খেয়াল রাখা উচিত ঃ

১. সাইলেজ তৈরির জন্য ঘাসে অবশ্যই ৩০-৩৫ শতাংশ শুষ্ক পদার্থ থাকা প্রয়োজন।
২. নীচু জায়গায় সাইলো করা যাবে না।
৩. উপরের পলিথিন সুন্দর ভাবে এঁটে দিতে হবে যাতে কোন পানি সাইলেজ এর ভিতরে প্রবেশ না করে।
৪. চিটাগুড় পাতলা হলে পরিমাণ বাড়িয়ে পানি কম করে মিশাতে হবে অর্থাৎ এমনভাবে দ্রবণ তৈরি করতে হবে যাতে আঠার মত ঘাসের গায়ে লেগে থাকে।
৫. ঘাস এবং খড় এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে ফাঁকা জায়গাগুলো যথাসম্ভব বন্ধ হয়ে যায়। বিশেষ করে, সাইলোর কোনাগুলো এবং পাশসমূহ পা দিয়ে পাড়িয়ে ঘাস সাজাতে হবে।
৬. গরু, বাছুর, শেয়াল, কুকুর বা অন্য প্রাণি যাতে উপরের পলিথিন নষ্ট না করে সেদিকে খেয়াল করতে হবে।

সাইলেজ তৈরীতে প্রয়োজনে এডিটিভ বা প্রিজারভেটিভ সংযোজন করতে হবে–

সাইলেজ এডিটিভ বা প্রিজারভেটিভ ঃ (১) নালীগুড় ঃ ৩-৪% হারে (২) ইউরিয়া ঃ ০.৫% হারে (৩) লাইমস্টোন ঃ ০.৫-১% হারে (৪) জৈব এসিড ঃ ১% হারে(৫) ব্যাটেরিয়াল কালচার ঃ প্রয়োজন মত

সাইলেজের উপকারিতা ঃ

১. ঘাসের সাইলেজে ৮৫% পুষ্টি পাওয়া যায়।
২. এখানে ঘাসের সমস্ত অংশই সংরক্ষণ করা যায়।
৩. বর্ষা মৌসুমে কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ করা কঠিন কিন্তু সাইলেজ সহজেই করা সম্ভব।
৪. সাইলেজ অত্যন্ত সুস্বাদু ও ল্যাকটিক এসিড সমৃদ্ধ খাদ্য।
৫. এটা আমিষ ও ভিটামিনের উৎস।

ভাল সাইলেজের বৈশিষ্ট্য ঃ

১. সাইলেজের রং হলুদাভ সবুজ।
২. গন্ধ-আচারের ন্যায় অম্ল সুগন্ধ।
৩. পিএইচ মাত্রা ৩.৫-৪.৫।

গবাদিপশুকে সাইলেজ খাওয়ানো ঃ

গবেষণায় দেখা গেছে যে, ১০০ কেজি ওজনের একটি ষাঁড় দৈনিক গড়ে তার দৈহিক ওজনের ১.৯২ হারে সাইলেজ শুষ্ক পদার্থ গ্রহণ করে থাকে। দুধাল গাভী প্রতিদিন কি পরিমাণ দুধ উৎপাদন করে তার উপর ভিত্তি করে সাইলেজ সরবরাহ করতে হয়। গবেষণায় দেখা যায় যে, যেখানে সাইলেজকে একক রাফেজ হিসেবে ব্যবহৃত, সেখানে একটি গাভী প্রতি ৫০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৩ কেজি পরিমান সাইলেজ গ্রহণ করে থাকে। সাইলেজ এর সংগে কাঁচা ঘাস অথবা শুকনা খড়ও একত্রে গবাদিপশুকে খাওয়ানো যেতে পারে। সাধারণ নিয়মে দুই ভাগ সাইলেজ এর সাথে এক ভাগ কাঁচা ঘাস ও এক ভাগ খড় মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।

সেশন-১০

গো-খাদ্য হিসেবে হাইড্রোপনিক ঘাস চাষ প্রযুক্তি

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- হাইড্রোপনিক ঘাস সম্পর্কে ধারণা
- হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে ঘাস চাষ
- হাইড্রোপনিক ঘাসের উপকারিতা
- হাইড্রোপনিক ঘাসের পুষ্টিমান

হাইড্রোপনিক ঘাস চাষ পদ্ধতি-

হাইড্রোপনিক ঘাস ঃ বিশ্বে তথ্য-প্রযুক্তির উৎকর্ষতা এবং কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়নের ছোঁয়া লাগায় বর্তমানে আমাদের দেশেও মাটি বিহীন ঘাস চাষ শুরু হয়েছে। মাটির স্পর্শ ছাড়াই পানির ওপর ফসল উৎপাদনের হাইড্রোপনিক পদ্ধতি আমাদের দেশে অবিস্কার করেছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট। প্রতি বছর জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারনে ব্যাপক হারে কমে যাচ্ছে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ। তাই গোখাদ্যের চাহিদা পূরণে মাটি ছাড়াই হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতেঘাস চাষ হতে পারে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের একটি উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য উৎপাদন কৌশল।
জমিতে ঘাস চাষের প্রচলিত ধারণা বদলে ঘরের ভেতরে মাটি ছাড়া প্লাস্টিক ট্রে এর ভিতর ঘাস বীজ স্থাপন করে কেবল পানি ছিটিয়ে কাঁচা ঘাস উৎপাদনে এই হাইড্রোপনিক ফডার প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বল্প সময়ে, স্বল্প পরিসরে ও কম খরচে গোখাদ্য উৎপাদন খুবই উপযোগী। এই ঘাসে বাজারের দানাদার ও মাঠের সবুজ ঘাসের প্রায় সব পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান থাকে। তাই ধীরে ধীরে প্রযুক্তিটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে হাইড্রোপনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পশুখাদ্য তৈরি খুবই সম্ভাবনাময় একটি প্রযুক্তি। শুধু এই খাদ্য দিয়ে গরু, ছাগল, ভেড়া, খরগোশ ও রাজহাঁস পালন করা সম্ভব।

হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে বীজ হিসেবে গম, ছোলা, খেসারি, ভুট্টা, সয়াবিন, মাষকলাইসহ বিভিন্ন শস্যের অংকুরোদগম বীজ ব্যবহার করে ঘাস উৎপাদন করা যায়।

হাইড্রোপনিক ঘাস চাষ পদ্ধতি (ভুট্টা ঘাস) ঃ প্রথম ভালো মানের ভূট্টার বীজকে ১২ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর পানি ঝরিয়ে ভেজা চটের বস্তা অথবা কালো সুতি কাপড়ের ভেতরে করে ২৪ ঘন্টা অন্ধকার স্থানে রাখতে হয়। শেষে একপাশ ছিদ্র যুক্ত ট্রের ভেতরে পাতলা করে ঐ বীজ বিছিয়ে কালো কাপড় দিয়ে দুই দিন ঢেকে রাখতে হবে। এই দুই দিন খেয়াল রাখতে হয়, বাইরের আলো-বাতাস যেন না লাগে। কাপড়টি সারাক্ষণ ভেজা রাখতে হয়। তৃতীয় দিন কাপড় সরিয়ে আধাঘন্টা পরপর পানি ছিটাতে হবে। তারপর টিনশেডের একটি ঘরে বাঁশ বা কাঠের তাক বানিয়ে ট্রেগুলো সাজিয়ে রাখতে হয়। এক কেজি বীজ থেকে ৯-১০ দিন পরে ৭ থেকে ৮ কেজি ঘাস পাওয়া যায়। পাঁচ বিঘা জমিতে যে পরিমাণ ঘাস উৎপাদন করা হয় তা মাত্র ৩০০ বর্গফুটের একটি টিন শেডের ঘরে সেই পরিমাণ হাইড্রোপনিক ঘাস উৎপাদন করা সম্ভব।

হাইড্রোপনিক ঘাসের উপকারিতা ঃ হাইড্রোপনিক ঘাস গবাদিপশুর জন্য খুবই উপকারী। এই ঘাস পুষ্টিসমৃদ্ধ ও সুস্বাদু। এই ঘাসে বীজ ও মুল সংযুক্ত থাকে বিধায় এটিকে আঁশ ও দানাদার উভয় প্রকার খাদ্যের সংমিশ্রণে একটি সুষম খাদ্য বলা যায়। এ খাদ্যে প্রচুর পরিমানে পানি থাকে ফলে প্রাণির শরীরের পানিশূণ্যতাও হ্রাস পায়।

প্রচলিত সবুজ ফডার উৎপাদন এবং হাইড্রোপনিক সবুজ ফডার উৎপাদনের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য ঃ

ক্রমিক	প্রয়োজনীয়তা	প্রচলিত সবুজ ফডার উৎপাদন	হাইড্রোপনিক সবুজ ফডার উৎপাদন	তুলনামূলক সুবিধা
১.	আয়তন	১০০০ ব.মি.	৫০ ব.মি.	কম পরিমান জমি
২.	ফডার উৎপাদন সময় (দিন)	৬০-৭০ দিন	৭দিন	কম সময়
৩.	পানি ও বিদ্যুৎ খরচ	খুব বেশী	খুব কম	কম পানি ও বিদ্যুৎ
৪.	জমির উর্বরতা	জরুরী	জরুরী নয়	জমির উর্বরতা শক্তি
৫.	সার	প্রয়োজন	প্রয়োজন নয়	কম সার
৬.	ফডারের উৎপাদন নির্ভরতা	প্রাকৃতিক বৃষ্টি, পানি নির্ভর	নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ	নির্ভরতা
৭.	প্রাণির ফডার গ্রহণ	আংশিক	সম্পূর্ন	কম অপচয়
৮.	শ্রম ব্যাবহার	বেশী	কম	শ্রম সাশ্রয়ী
৯.	প্লট ঘেরা ও নিরাপত্তা	প্রয়োজন হয়	প্রয়োজন হয় না	ঘেরা খরচ কম
১০.	ফডার খাবার অভ্যাস	কেটে টুকরা করে	প্রয়োজন হয় না	গময় ও শ্রম সাশ্রয়ী

হাইড্রোপনিক ঘাসের পুষ্টি উপাদান ঃ

পুষ্টি উপাদান (%)	প্রচলিত সবুজ ফডার (ভুট্টা)	হাইড্রোপনিক সবুজ ফডার (ভুট্টা)
প্রোটিন	১০.৬৭	১৩.৫৭
ইথার এক্সট্রাক্ট (ফ্যাট)	২.২৭	৩.৪৯
ক্রুড ফাইবার (আঁশ)	২৫.৯২	১৪.০৭
নাইট্রোজেন মুক্ত এক্সট্র্যাক্ট	৫১.৭৮	৬৬.৭২
মোট অ্যাশ (খনিজ)	৯.৩৬	৩.৮৪

সেশন-১১

গো-খাদ্য হিসেবে এ্যালজি উৎপাদন ও ব্যবহার

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- এ্যালজির পুষ্টিমান ও উৎপাদন পদ্ধতি
- গরুকে এ্যালজি খাওয়ানোর নিয়ম
- গরুকে এ্যালজি খাওয়ানোর উপকারীতা

গো-খাদ্য হিসেবে এ্যালজি উৎপাদন ও ব্যবহার ঃ

এ্যালজি এক ধরনের এককোষী উদ্ভিদ যা পুষ্টিকর গো-খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে। এরা অত্যন্ত দ্রুত বর্ধনশীল বিশেষ করে বাংলাদেশের মত উষ্ণ জলবায়ুতে। আমাদের দেশে সাধারনত: দুটি বিশেষ প্রজাতির এককোষী এ্যালজি ক্লোরেলা ও সিনেডেসমাস চাষ করা হয়ে থাকে।

এ্যালজির পুষ্টিমান ঃ বিভিন্ন ধরনের অপ্রচলিত খাদ্যের মধ্যে এ্যালজি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় পুষ্টিকর প্রাণিখাদ্য যা বিভিন্ন ধরনের আমিষ জাতীয় খাদ্য যেমন-খৈল, শুটকি মাছের গুঁড়া ইত্যাদির বিকল্প হিসাবে ব্যবহার হতে পারে। শুষ্ক এ্যালজিতে শতকরা ৫০-৭০ ভাগ আমিষ বা প্রোটিন থাকে, ২০-২২ ভাগ চর্বি এবং ৮-২৬ ভাগ শর্করা থাকে। এছাড়া ভিটামিন-এ, বি, সি, ই এবং কে রয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিমানে। রোমন্থনকারী প্রাণিতে (গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া) এ্যালজির প্রোটিনের পাচ্যতা ৭৩%।

এ্যালজির উৎপাদন পদ্ধতি ঃ

এ্যালজি চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ এ্যালজির বীজ, কৃত্রিম অগভীর পুকুর, টিউবয়েলের পরিস্কার পানি, মাসকলাই বা অন্যান্য ডালের ভূষি এবং ইউরিয়া।

- প্রথমে সমতল, ছায়াযুক্ত জায়গায় একটি কৃত্রিম পুকুর তৈরী করতে হবে। পুকুরটি লম্বায় ১০ ফুট, চওড়ায় ৪ ফুট এবং গভীরতায় ১/২ ফুট হতে পারে। পুকুরের পাড় ইট বা মাটির তৈরী হতে পারে। এবার ১১ ফুট লম্বা, ৫ ফুট চওড়া একটি স্বচ্ছ পলিথিন বিছিয়ে কৃত্রিম পুকুরের তলা ও পাড় ঢেকে দিতে হবে। তবে পুকুরের আয়তন প্রয়োজন অনুসারে ছোট বা বড় হতে পারে। তাছাড়া মাটির বা সিমেন্টের চাড়িতেও এ্যালজি চাষ করা যায়।
- ১০০ গ্রাম মাসকলাই (বা অন্য ডালের) ভূষিকে ১ লিটার পানিতে সারারাত ভিজিয়ে কাপড় দিয়ে ছেঁকে পানিটুকু সংগ্রহ করতে হবে। একই ভূষিকে অন্তত: তিনবার ব্যবহার করা যায়, যা পরবর্তীতে গরুকে খাওয়ানো যায়।
- এবার কৃত্রিম পুকুরে ২০০ লিটার পরিমাণ কলের পরিস্কার পানি, ১৫-২০ লিটার পরিমান এ্যালজির বীজ, যা এ্যালজির ঘনত্বের উপর নির্ভর করে এবং মাসকলাই ভূষি ভেজানো পানি নিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর ২-৩ গ্রাম পরিমাণ ইউরিয়া নিয়ে উক্ত পুকুরের পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
- এরপর প্রতিদিন সকাল, দুপুর ও বিকেলে কমপক্ষে তিনবার এ্যালজির কালচারকে নেড়ে দিতে হবে। পানির পরিমাণ কমে গেলে নতুন করে পরিমাণ মত পরিস্কার পানি যোগ করতে হয়।
- এভাবে উৎপাদনের ১২-১৫ দিনের মধ্যে এ্যালজির পানি গরুকে খাওয়ানোর উপযুক্ত হয়। এ সময় এ্যালজির পানির রং গাঢ় সবুজ বর্ণের হয়। এ্যালজির পানিকে পুকুর থেকে সংগ্রহ করে সরাসরি গরুকে খাওয়ানো যায়।
- একটি পুকুরের এ্যালজির পানি খাওয়ানোর পর উক্ত পুকুরে আগের নিয়ম অনুযায়ী পরিমাণ মত পানি, সার, এবং মাসকলাই ভূষি ভেজানো পানি দিয়ে নতুন করে এ্যালজি কালচার শুরু করা যায়, এ সময় নতুন করে এ্যালজি বীজ দিতে হয় না।

- যখন এ্যালজি পুকুরে পানির রং স্বাভাবিক গাঢ় সবুজ রং থেকে বাদামী রং হয়ে যায় তখন বুঝতে হবে যে উক্ত কালচারটি কোন কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে নতুন করে কালচার শুরু করতে হবে।

গরুকে এ্যালজি খাওয়ানো পদ্ধতি ঃ এ্যালজির পানি সব বয়সের গরুকে খাওয়ানো যায়। এ্যালজি খাওয়ানোর কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। এটাকে সাধারণ পানির পরিবর্তে সরাসরি খাওয়ানো যায়। এক্ষেত্রে গরুকে আলাদা করে পানি খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। দানাদার খাদ্য অথবা খড়ের সাথে মিশিয়েও খাওয়ানো যায়। সাধারণত: দুই এক দিনের মধ্যেই গরু এতে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। গরু সাধারণত: তার ওজনের ৮ ভাগ অর্থাৎ ১৫০ কেজি ওজনের একটি গরু ১২ কেজি পরিমান এ্যালজির পানি পান করতে পারে। তবে গরমের দিনে এর পরিমাণ বাড়তে পারে। এ্যালজি শুকিয়ে সংরক্ষণ করেও গবাদিপশুকে খাওয়ানো যায়।

এ্যালজি খাওয়ানোর উপকারীতা ঃ রোমন্থনকারী প্রাণি যেমন গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া যে ঘাস বা খড় ইত্যাদি খেয়ে থাকে তা পাকস্থলীর জীবাণু দ্বারা ভেঙ্গে হজম হয়। এই জীবাণুর পরিমাণ এবং কার্যক্রম খাদ্যের উপর নির্ভর করে। যদি ভাল মানের খাদ্য অর্থাৎ পরিমাণ মত প্রোটিন, সহজপাচ্য কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন এবং খনিজযুক্ত খাবার খায় তা হলে এই জীবাণুর পরিমাণ ও কার্যক্রম বেড়ে যায় ফলে গরুতে প্রোটিন এবং বিপাকীয় শক্তি সরবরাহ বেড়ে যায়। আবার যদি নিম্নমানের খাদ্য যেমন-খড় খায় তবে গরু তার চাহিদা মত বিপাকীয় শক্তি ও প্রোটিন পায় না। তাই শুধু খড় খাওয়ালে গরুর উৎপাদন কমে যায়। খড়ের সাথে সাধারণ পানির পরিবর্তে এ্যালজির পানি খাওয়ালে বাড়ন্ত গরুর মাইক্রোবিয়াল প্রোটিন সরবরাহ বেড়ে যায় এবং গরুর দৈহিক ওজন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এ্যালজি খাওয়ালে আমিষ জাতীয় দানাদার খাদ্য কম লাগে এতে গবাদিপশু পালনে খরচ অনেকাংশে কমে যায়।

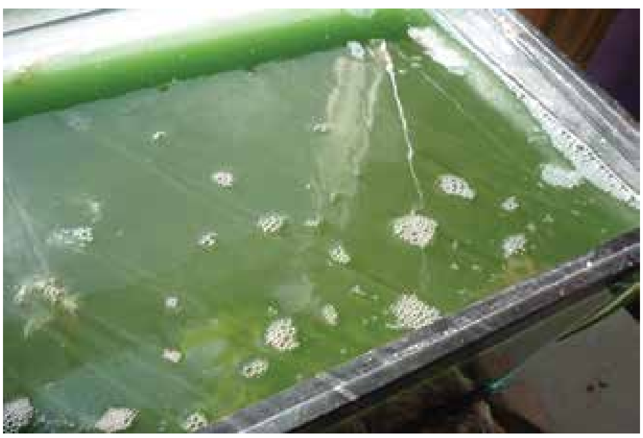

সেশন-১২

গো-খাদ্য হিসেবে কলা গাছ সংরক্ষন ও ব্যবহার।

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- গো-খাদ্য হিসেবে কলা গাছের সংরক্ষণ
- কলাগাছ সাইলেজের বৈশিষ্ট্য
- কলাগাছ সাইলেজ খাওয়ানোর পদ্ধতি

বাংলাদেশে প্রতি বছর কলা সংগ্রহের পর প্রায় ২৫-৩০ লক্ষ মেট্রিক টন কলাগাছ পাওয়া গেলেও এর খুব নগন্য অংশই গো-খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হয়। সারা বছরের মধ্যে বর্ষা মৌসুমেই কলা উৎপাদনের পরিমাণ বেশী। উৎপন্ন কলা গাছ বৃষ্টির কারণে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। গো-খাদ্য হিসেবে এর উপযোগীতা ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক।

কলাগাছ গো-খাদ্য হিসাবে দু'ভাবে ব্যবহার করা যায় (ক) সাইলেজ প্রক্রিয়ায় ব্যবহার এবং (খ) সরাসরি মিশ্র খাদ্য হিসাবে ব্যবহার।

সাইলেজ তৈরীর প্রক্রিয়া ঃ এ পদ্ধতিতে কলাগাছের টুকরোর সাথে শুকনো খড় ব্যবহার করে অথবা না করেও সাইলেজ তৈরী করা যায়। সাইলেজ তৈরীর প্রয়োজনীয় উপকরন গুলো হলো-উঁচু জায়গায় মাটির গর্ত, খড়কুটা, পলিথিন, চিটাগুড়, পানি এবং টুকরো কলাগাছ।

কলাগাছ সংরক্ষণ মাটির গর্ত অথবা পাকা সাইলোতে করা যায়। তবে পাকা সাইলো খুব ব্যয়বহুল। এ জন্য উঁচু জায়গায় লম্বালম্বি মাটির গর্ত খুঁড়ে কলাগাছ সংরক্ষণ করা যায়। মাটির গর্তটির উপরিভাগের প্রশস্থে ৩.১ মিটার, মাঝামাঝি গভীরতায় ২.৫ মিটার এবং তলায় ১.৫ মিটার হবে। এর ফলে গর্তটি কোনাকৃতি না হয়ে পাতিলের তলার ন্যায় বাঁকানো হবে। গর্তটির গভীরতা ৯২ সেন্টিমিটার হবে। দৈর্ঘ্য নির্ভর করবে কলাগাছের পরিমাণের উপর। কলা সংগ্রহ করার পর কলাগাছ চপার মেশিন বা কাস্তে দ্বারা ছোট ছোট (দৈর্ঘ্য ২-৩ সে.মি.) করে কাটতে হবে। তারপর উক্ত গর্তে টুকরো টুকরো কলাগাছ স্তরে স্তরে সাজাতে হবে। পানির সাথে চিটাগুড়ের ১ঃ১ অনুপাতের দ্রবণ সমভাবে ছিটিয়ে ভালভাবে মিশাতে হবে।

প্রতি ১০০ কিলোগ্রাম কলাগাছের সাথে ২.০-২.৫ কিলোগ্রাম চিটাগুড় দ্রবণ মিশাতে হবে। চিটাগুড়ের দ্রবণটি আস্তে আস্তে ঝরনা বা হাত দিয়ে বিছানো কলাগাছের উপর ছিটিয়ে দিতে হবে। একশ ঘনফুট একটি মাটির গর্তে ৮-১০ মেট্রিক টন কলাগাছ সংরক্ষণ করা যায়। গর্তটি অবশ্যই উঁচু জায়গায় হতে হবে। গর্তে তলায় ও চারিদিকে পুরু করে শুকনো খড় বা পলিথিন বিছাতে হবে। পরতে পরতে চিটাগুড় মিশ্রিত কলাগাছ গর্তে সাজাতে হবে এবং পা দিয়ে চেপে ভিতরের বাতাস যথা সম্ভব বের করে দিতে হবে। যত এঁটে সাজানো যাবে তত ভাল সাইলেজ হবে। এভাবে ভর্তি করে মাটির উপরে প্রায় ৯০-১২২ সে.মি. পর্যন্ত কলাগাছ সাজাতে হবে। সাজানো শেষ হলে খড় দ্বারা পুরু করে আস্তরন দিয়ে সুন্দর করে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। সবশেষে ৮-১০ সে.মি. পুরু করে মাটি দিতে হবে।

উন্নত কলাগাছ সাইলেজের বৈশিষ্ট্যাবলী ঃ

সাইলেজের ধরন	পিএইচ	গন্ধ	রং	বাহ্যিক গঠন
ক) চিটাগুড় মিশ্রিত কলাগাছের সাইলেজ	৪.৪	অম্লীয়	হলুদাভ সবুজ	টুকরো কলাগাছ অবিকৃত থাকে
খ) খড়সহ চিটাগুড় মিশ্রিত কলাগাছের সাইলেজ	৪.৩	অম্লীয়	হলুদাভ সবুজ	টুকরো কলাগাছ অবিকৃত থাকে
গ) চিটাগুড় ছাড়া কলাগাছের সাইলেজ	৭.০	দুর্গন্ধ	কালচে	টুকরো কলাগাছ বিকৃত হয়ে যায়

কলাগাছের বিভিন্ন অংশের পুষ্টিমান ঃ

উপাদান	কলাগাছের কান্ড	কলাগাছের পাতা	
		সবুজ পাতা	পাতার ডগা
শুষ্ক পদার্থ	৫.৯	২১.০	৯.৪
জৈব পদার্থ	৮৯.৫	৯০.২	৯১.৬
আমিষ	৭.৩	৮.৮	৪৩.৭
এডিএফ	৪৮.৪	৩৯.২	৪৩.৭

কলাগাছ সাইলেজ খাওয়ানোর পদ্ধতিঃ

প্রতি একশত (১০০) কেজি কলাগাছের সাথে ২০০ গ্রাম ইউরিয়া পরিস্কার জায়গায় মিশ্রণ প্রক্রিয়া শেষে গরুকে সরবরাহ করা যেতে পারে। গবাদিপশুতে কলাগাছের সাইলেজ পরিপাচ্যতার হার প্রায় ৬০% এবং কলাগাছ সাইলেজ খাওয়ানোর ফলে গরুর দৈহিক ওজন প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৪১০ গ্রাম বৃদ্ধি পায়।

সুবিধাঃ

- শ্রমিক খরচ, ইউরিয়া ও মোলাসেস ক্রয় ব্যতীত অন্য কোন খরচ নেই।
- প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের একটি গরু প্রতিদিন ১৩ কেজি প্রক্রিয়াজাতকৃত কলাগাছ অথবা খড় মিশ্রিত সাইলেজের ৮ কেজি খেতে পারে, যার দ্বারা পশুর শরীরের রক্ষণাবেক্ষণ সহ দৈহিক ওজনও বৃদ্ধি পায়।
- যেহেতু ইউরিয়া ও চিটাগুড় কলাগাছের সাথে ধীরে ধীরে খাচ্ছে অতএব বিষক্রিয়া হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।
- কলা উৎপাদনের পাশাপাশি কলাগাছকে প্রক্রিয়াজাত করে গরুকে সরাসরি খাওয়ানো যায় অথবা পরবর্তী সময়ে খাওয়ানোর জন্য সাইলেজ করে রাখা যায়।

সেশন-১৩

গবাদিপশুর ব্রিডিং পদ্ধতি এবং বাংলাদেশে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন কার্যক্রম

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- গবাদিপশুর বিভিন্ন ব্রিডিং বা মেটিং পদ্ধতি
- বাংলাদেশে গবাদিপশুর প্রজনন নীতিমালা
- বাংলাদেশে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন কার্যক্রম

গবাদিপশুর বিভিন্ন ব্রিডিং বা মেটিং পদ্ধতি ঃ
ব্রিডিং ঃ ব্রিডিং বলতে সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের মিলনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের সৃষ্টিকে বুঝায়।

ব্রিডিং পদ্ধতির শ্রেণীবিভাগ নিম্নে দেওয়া হলো-

সমাগম প্রজনন পদ্ধতি ঃ

১. ক্লোজ ব্রিডিং
২. আউট ব্রিডিং
৩. ক্লোজ ব্রিডিং ঃ ক. ইনব্রিডিং বা আন্তঃপ্রজনন খ. লাইন ব্রিডিং বা সারি প্রজনন
৪. আউট ব্রিডিং ঃ ক. ক্রসব্রিডিং বা সংকর প্রজনন থ. আউটক্রসিং বা বহিঃক্রসিং গ. ব্যাকক্রসিং বা পশ্চাৎ ক্রসিং ঘ. টপক্রসিং বা শীর্ষ ক্রসিং ঙ. গ্রেডিং আপ বা উন্নীতকরণ

ক্লোজ ব্রিডিং (Closebreeding) ঃ রক্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রাণিদের মধ্যে মিলন ঘটলে তাকে ক্লোজব্রিডিং বলে।
ইনবিডিং (Inbreeding) ঃ যে পদ্ধতিতে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত দুটো প্রাণির মিলন ঘটিয়ে বংশধারা ও গুণাবলী অব্যাহত রাখা হয় তাকে ইনব্রিডিং বা আন্তঃপ্রজনন বলা হয়। এই প্রক্রিয়ার অংশগ্রহনকারী প্রাণি পিতা-মাতা ঘনিষ্ঠ রক্ত সম্পর্কযুক্ত। যেমন-আপন ভাই বোন, সৎ ভাই বোন ইত্যাদি ।

ইনব্রিডিং এর প্রভাব (Effect of Inbreeding) ঃ

- ইনব্রিডিং এর মাধ্যেমে কোনো নতুন ধরনের জিনের সৃষ্টি হয় না।
- সাধারণত ইনব্রিডিং এর ফলে দৈহিক বৃদ্ধি হ্রাস পায়।
- দীর্ঘ দিন ধরে ইনব্রিডিং করলে প্রজনন ক্ষমতা কমে যায় এবং মৃত্যুহার বৃদ্ধি পায়।
- দীর্ঘদিন ধরে ইনব্রিডিং চলতে থাকলে প্রাণির সজীবতা কমে যায়।
- ইনব্রিডিং এর ফলে বংশনুক্রমিক অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়।

লাইনব্রিডিং (Line Breeding) ঃ একই জাতের উত্তম গুণাবলি সম্পন্ন দূর সম্পর্কীয় প্রাণিদের মধ্যে যখন প্রজনন ঘটানো হয় তখন তাকে লাইন ব্রিডিং বলে। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে চাচাত,মামাত,ফুফাত ভাই বোনদের মাঝে অথবা আরও দূরসম্পর্কীয় প্রাণিদের মাঝে মিলন ঘটানো হয় ।উদাহরণসরুপ বলা যায় দাদা-নাতনী অথবা মামাত ভাই ও ফুফাত বোনের মধ্যে যে প্রজনন ঘটে সেটাই লাইনব্রিডিং।
আউটব্রিডিং (Out Breeding) ঃ যে প্রজনন পদ্ধতিতে সম্পর্কহীন বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত নয় এমন প্রাণিদের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করা হয় তাকে আউটব্রিডিং বলে। আউটব্রিডিং ইনব্রিডিং এর বিপরীত প্রক্রিয়া।

ক্রসব্রিডিং বা সংকর প্রজনন (Cross Breeding) ঃ সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের দুটো প্রাণির মধ্যে মিলন ঘটিয়ে যে প্রজনন কার্য সম্পন্ন করা হয় তাকে ক্রসব্রিডিং বলে। ক্রসব্রিডিং দুটো ভিন্ন প্রতিষ্ঠিত জাতের মধ্যে করা হয়। সাধারণত নতুন জাত উদ্ভাবনের জন্য এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। যেমন- জার্সি গাভীর সাথে শাহীওয়াল ষাঁড়ের প্রজনন ঘটিয়ে যদি নতুন জাত উদ্ভাবন করা হয় তবে সেটা হবে ক্রসব্রিডিং।

আউটক্রসিং (Out Crossing) ঃ যখন কোনো প্রজননকারী তার খামারের গবাদিপশুর কৌলিক মানে নতুন বৈচিত্র্য আনার উদ্দেশ্য বাইরে থেকে ষাঁড় নিয়ে এসে প্রজনন ঘটান তখন তাকে আউটক্রসিং বলে।

ব্যাক ক্রসিং (Back Crossing) ঃ দুটো বিশুদ্ধ জাতের মধ্যে ক্রসব্রিডিং এর ফলে সৃষ্ট সংকর জাতকে যদি পুনরায় তার মাতা বা পিতার সাথে প্রজনন করানো হয় তবে সেটা হবে ব্যাক ক্রসিং। উদাহারণস্বরুপ, জার্সি ও শাহীওয়ালের মধ্যে প্রজননের ফলে সৃষ্ট সংকর জাতকে যদি পুনরায় জার্সি বা শাহীওয়ালের সাথে প্রজনন করানো হয় তবে সেটাই হবে ব্যাক ক্রসিং ।

জার্সি X শাহীওয়াল

↓

সংকর জাত X (জার্সি বা শাহীওয়ালের সাথে)

ক্রিস ক্রসিং (CRISS CROSSING) ঃ ক্রিস ক্রসিং হলো ঐ প্রক্রিয়া যেখানে দুটো বিশুদ্ধ জাতের মধ্যে প্রজননের ফলে সৃষ্ট সংকর জাতের সাথে প্রথমে একটি বিশুদ্ধ জাতের প্রজনন ঘটাতে হবে এই প্রজননের ফলে সৃষ্ট সংকর জাতের সাথে আবার অপর একটি বিশুদ্ধ জাতের প্রজনন ঘটাতে হবে। উদাহারণসরুপ বিশুদ্ধ জার্সি ও শাহীওয়াল জাতের প্রজননে সৃষ্ট সংকর জাতের সাথে প্রথমে শাহীওয়াল জাতের মিলন ঘটানো হলো এবং এদের মিলনে উৎপন্ন সংকর জাতের সাথে জার্সি জাতের মিলন ঘটাতে হবে।

জার্সি X শাহীওয়াল

↓

সংকর জাত X শাহীওয়াল

↓

সংকর জাত X জার্সি

এভাবে প্রক্রিয়াটি অবিরতভাবে চলতে থাকবে।

গ্রেডিং আপ (Grading Up) বা উন্নীতকরণ ঃ গ্রেডিং আপ হলো দেশী বা অনুন্নত গাভীকে উন্নত জাতের ষাঁড়/সিমেন দিয়ে প্রজনন করানোর পর প্রথম প্রজন্মে যে বাচ্চা উৎপাদন হবে সেই বাচ্চাকে (স্ত্রী) কে প্রজননক্ষম হলে পুনরায় প্রথম বংশে ব্যবহৃত জাতের ষাঁড়/সিমেন দিয়ে প্রজনন করানোর ফলে ২য় প্রজন্মে যে বাচ্চা উৎপাদন হবেএকই এভাবে ঐ প্রজন্মের সাথে একই ব্লাড সম্পন্ন ষাঁড়ের সাথেপর্যায়ক্রমিক ব্রিডিং মাধ্যমে দেশী জাতের উন্নয়ন ঘটানোকে গ্রেডিং আপ বলে।

বাংলাদেশে গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে প্রজনন নীতিমালাঃ

বাংলাদেশে প্রকৃত পক্ষে ১৯৭৫-৭৬ সাল থেকে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বৃহৎ আকারে সম্প্রসারিত হতে থাকে।এসময় বিভিন্ন জাতের গরুর প্রথম বাচ্চা প্রসবকালীন সময়, বাচ্চার ওজন, গড় দুধ উৎপাদন,একবার বাচ্চা প্রদানের পর পুনরায় বাচ্চা প্রদানের মধ্যবর্তী সময়, দুধ উৎপাদনকাল, প্রতিদিন দুগ্ধ প্রদানের পরিমান, প্রতিদিন ওজন বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার সাভার এ বাংলাদেশের আবাহাওয়ায় উপযোগী জাত নির্বাচনের জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় এবং বিশেষজ্ঞগন দেশের গরুর জাত উন্নয়নকল্পে এলাকাভিত্তিক একটি প্রজনন নীতিমালা প্রনয়ন করেন যা ১৯৮২ সালে সরকার কর্তক অনুমোদন লাভ করে। এই নীতি অনুযায়ী শহর ও শহরতলী এবং যে এলাকায় দুধ উৎপাদন বেশী হয় সে সকল স্থানে খাঁটি শাহীওয়াল জাতের মা ও খাঁটি ফ্রিজিয়ান জাতের ষাঁড়ের সিমেন বা বীজ দ্বারা উৎপাদিত ষাঁড়ের (৫০% এফ X ৫০% এসএল) সিমেন বা বীজ এবং গ্রামীণ এলাকায় দেশী জাতের গাভী ও খাঁটি ফ্রিজিয়ান জাত দ্বারা উৎপাদিত (৫০% এল X ৫০% এফ) ষাঁড়ের সিমেন বা বীজ ব্যবহার করা হতো। পরবর্তীতে ২০০৭ সালে বাংলাদেশের গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে একটি স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি প্রজনন নীতিমালা গ্রহন করা হয়। এই নীতিমালার আলোকে মাঠ পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণের মাধ্যমে জাত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহন করা হয় যা অদ্যাবধি চালু রয়েছে।

স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি প্রজনন নীতিমালা ঃ
খামার ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গবাদিপশুর মোট সংখ্যাকে(গরু ও মহিষ) ৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১) অধিক মাত্রার ইনপুট সরবরাহ ঃ- যেখানে গবাদিপশুকে সম্পূর্ণরূপে খামারে আবদ্ধ রেখে লালন পালন করা। এ পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ খাদ্য সরবরাহ করা হয়। খামার ব্যবস্থাপনার এই পদ্ধতিকে সম্পূর্ন আবদ্ধ (Intensive) পদ্ধতি বলে।

২) মধ্যম মাত্রার ইনপুট সরবরাহঃ- যেখানে গবাদিপশুকে আংশিকভাবে খামারে আবদ্ধ অবস্থায় লালন পালন করা হয় এবং আংশিক ভাবে সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করা হয়। খামার ব্যবস্থাপনার এই পদ্ধতিকে সেমি অর্দ্ধ আবদ্ধ (Semi-Intensive) পদ্ধতি বলে।

৩) নিম্ন মাত্রার ইনপুট সরবরাহঃ- যেখানে গবাদিপশুকে প্রথাগত পদ্ধতিতে খাদ্য শস্যের উচ্ছিষ্ট এবং প্রাকৃতিক ঘাসের উপর নির্ভর করে লালন পালন করা হয়। এই পদ্ধতিতে যৎসামান্য সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করা হয়। খামার ব্যবস্থাপনার এই পদ্ধতিকে প্রথাগত (Traditional) পদ্ধতি বলে।

ক) স্বল্প মেয়াদী নীতিমালা ঃ-

১. ইনটেনসিভ পদ্ধতি ঃ এ পদ্ধতিতে পালিত অধিক উৎপাদনশীল সংকর জাতের হলিষ্টিন ফ্রিজিয়ান গাভীকে (প্রতিদিন দুধ উৎপাদন ১০ কেজি বা অধিক) বিদেশ হতে আমদানীকৃত প্রজেনি টেষ্টেড হলিষ্টিন ফ্রিজিয়ান ষাঁড়ের সিমেন দিয়ে প্রজনন করানো। উল্লেখ্য যে, উক্ত হলিষ্টিন ফ্রিজিয়ান ষাঁড়ের মায়ের দুধ উৎপাদন ক্ষমতা ৯৫০০-১০০০০ কেজি (৩০৫ দিনের গড় দুধ উৎপাদন) হতে হবে।

বাস্তবায়ন কৌশল ঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন নিবন্ধনকৃত খামরীদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ ১০% খামারীকে তাদের খামারের উৎপাদন দক্ষতার উপর ভিত্তি করে উক্ত নীতিমালা প্রয়োগ করতে হবে।

২. সেমি ইনটেনসিভ পদ্ধতি ঃ এ পদ্ধতিতে পালিত সংকর জাতের হলিস্টিন-ফ্রিজিয়ান গাভীকে (দুধ উৎপাদন ক্ষমতা ৬-১০কেজি/দিন) প্রজেনি টেস্টেড ৫০% হলিস্টিন ফ্রিজিয়ান ষাঁড়ের সিমেন দিয়ে প্রজনন করাতে হবে। উক্ত সংকর জাতের ষাঁড়ের মায়ের দুধ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৪৫০০ কেজি (৩০৫দিনের গড় দুধ উৎপাদন) হতে হবে। গাভী (এলএফ)×ষাঁড়(এলএফ)

বিশুদ্ধ শাহীওয়াল অথবা সংকর জাতের শাহীওয়াল গাভীকে বিশুদ্ধ শাহীওয়াল জাতের ষাঁড়ের সিমেন দিয়ে প্রজনন করানো হবে। উক্ত ষাঁড়ের মায়ের দুধ উৎপাদন ক্ষমতা কমপক্ষে ২৫০০ কেজি বা ততোধিক হতে হবে।গাভী (এসএল) × ষাঁড় (এসএল) অথবা গাভী (এল×এসএল) ×ষাঁড় (এসএল)

৩. প্রথাগত পদ্ধতি ঃ এ পদ্ধতিতে পালিত দেশী গাভীকে প্রজেনি টেস্টেড/পিডিগ্রি জানা শাহীওয়াল, পাবনা, রেড চিটাগাং, মুন্সিগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চলের উন্নতদেশী ষাঁড়ের সিমেন দিয়ে প্রজনন করাতে হবে। গাভী (এল)×ষাঁড় (এসএল), পাবনাগাভী×পাবনা (পিডিগ্রি জানা) ষাঁড় (উন্নত), আরসিসি গাভী×আরসিসি ষাঁড় (উন্নত), মুন্সিগঞ্জ গাভী×মুন্সিগঞ্জ ষাঁড় (উন্নত), দেশী গাভী×উন্নত দেশী ষাঁড় (দেশের অন্যান্য অঞ্চলের)

খ) মধ্য মেয়াদী নীতিমালা ঃ-

১. ইনটেনসিভ পদ্ধতি ঃ এ পদ্ধতিতে পালিত অধিক উৎপাদনশীল সংকর জাতের হলিষ্টিন ফ্রিজিয়ান গাভীকেবিদেশ হতে আমদানীক্রত প্রজেনি টেষ্টেড হলিষ্টিন ফ্রিজিয়ান ষাঁড়ের সিমেন দিয়ে প্রজনন করানো। উক্ত হলিষ্টিন ফ্রিজিয়ান ষাঁড়ের মায়ের দুধ উৎপাদন ক্ষমতা ৯৫০০-১০০০০ কেজি(৩০৫ দিনের গড় দুধ উৎপাদন) হতে হবে।

বাস্তবায়ন কৌশল ঃ যে সকল খামারে ১০ বা ততোধিক প্রজননক্ষম গাভী থাকবে সে সকল খামারে উক্তনীতিমালা প্রযোজ্য হবে। গাভী (এলএফ)×ষাঁড় (এফ)।

২. সেমি-ইনটেনসিভ পদ্ধতি ঃ এ পদ্ধতিতে পালিত সংকর জাতের হলিষ্টিন-ফ্রিজিয়ান গাভীকে প্রজেনি টেস্টেড ৫০% হলিস্টিন ফ্রিজিয়ান ও ৫০% স্থানীয় জাতের ষাঁড়ের সিমেন দিয়ে প্রজনন করাতে হবে। উক্ত সংকর ষাঁড়ের মায়ের দুধ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৬০০০ কেজি (৩০৫ দিনের গড় দুধ উৎপাদন) হতে হবে। গাভী (এলএফ)×ষাঁড় (এফ)।

বিশুদ্ধ শাহীওয়াল অথবা সংকর জাতের শাহীওয়াল গাভীকে শাহীওয়াল জাতের ষাঁড়ের সিমেন দিয়ে প্রজনন করানো হবে। উক্ত ষাঁড়ের মায়ের দুধ উৎপাদন ক্ষমতা ২৫০০ কেজি বা ততোধিক (৩০৫ দিনের গড় দুধ উৎপাদন)। গাভী (এসএল)×ষাঁড় (এসএল), গাভী (এল×এসএল) ×ষাঁড় (এসএল)

৩. প্রথাগত পদ্ধতি ঃ এ পদ্ধতিতে পালিত দেশী গাভীকে প্রজেনি টেস্টেড/পিডিগ্রি জানা শাহীওয়াল, পাবনা, রেড চিটাগাং ও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের উন্নত দেশী ষাঁড়ের সিমেন দিয়ে প্রজনন করাতে হবে। গাভী (এল) ×ষাঁড় (এসএল), পাবনাগাভী×পাবনা (পিডিগ্রি জানা) ষাঁড় (উন্নত), আরসিসি গাভী×আরসিসি ষাঁড় (উন্নত), মুন্সিগঞ্জ গাভী× মুন্সিগঞ্জ ষাঁড় (উন্নত), দেশী গাভী×উন্নত দেশী ষাঁড় (দেশের অন্যান্য অঞ্চলের)

গ) দীর্ঘ মেয়াদী নীতিমালা ঃ-

দেশে দীর্ঘ মেয়াদী একটি উপযোগী প্রজনন নীতিমালা প্রনয়নের জন্য প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে অন্তভূক্ত করে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদীতে বাস্তবায়নাধীন প্রজনন নীতিমালার ফলাফল মূল্যায়ন করে দীর্ঘ মেয়াদী নীতিমালার কাজ চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন কার্যক্রম ঃ

দেশের গবাদি পশুর জাত উন্নয়নে স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে অষ্ট্রেলিয়া থেকে অনুদান হিসেবে ফ্রিজিয়ান ও জার্সি জাতের ১২৫টি গাভী ও ষাঁড় আমদানি করা হয়। সাভার কেন্দ্রীয় গো প্রজনন খামারে উক্ত আমদানিকৃত ষাঁড়ের সাথে দেশী গাভীর ক্রসব্রিডিং করানো হয়। উৎপাদিত ফ্রিজিয়ান সংকর জাতের বাছুরের উৎসাহজনক ফলাফলের ভিত্তিতে এর সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৭৫-৭৬ সালে সমগ্র দেশব্যাপী কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ প্রকল্প গ্রহন করা হয়। এসময় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক ২২টি জেলায় কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এসব কেন্দ্র থেকে ফ্রিজিয়ান ও শাহীওয়াল জাতের তরল সিমেন সংগ্রহ করে বিভিন্ন উপকেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম চালু করা হয়। দেশীয় গবাদিপশুর উন্নয়নে ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত জার্মান, ফ্রান্স, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও জাপান থেকে উন্নতমানের প্রায় ৪.৩লক্ষ ডোজ হিমায়িত সিমেন আমদানি করা হয় এবং দেশের বিভিন্ন খামারে ব্যবহার করা হয় যা দেশের গবাদি উন্নয়নে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। পরবর্তীতে ২০০৮ সাল থেকে দেশে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম ইউনিয়ন পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ প্রকল্প গ্রহন করা হয়। এসময় কেন্দ্রীয় কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগারের উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ২০১৪ সালে রাজশাহীতে একটি আঞ্চলিক কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার স্থাপন করা হয়। এই দুটি কেন্দ্রের মাধ্যমে বর্তমানে বছরে প্রায় ৪০ লক্ষ ডোজ হিমায়িত সিমেন উৎপাদন করে দেশের বিভিন্ন কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র ও পয়েন্টে সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় বর্তমানে দেশে সাভার ও রাজশাহীতে ২টি বুল ষ্টেশন কাম কৃত্রিম প্রজনন ল্যাব, ২২টি জেলাকৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, ৭২২টি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ৩৮৮৭টি কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট চালু আছে। কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পাশাপাশি সরকারী সমবায় বিভাগের মিল্কভিটাসহ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক, আমেরিকান ডেইরি, লালতীর, এসিআই সহ বেশকিছু প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব ব্রিডিং বুল থেকে সিমেন উৎপাদন করে নির্ধারিত এলাকায় কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশে বর্তমানে কৃত্রিম প্রজনন কভারেজের পরিমান প্রায় ৫০% এবং দেশে সংকর জাতের গরুর সংখ্যা প্রায় ৫৫%। বিগত দশ বছরে দেশে দুধের উৎপাদন প্রায় চার গুন এবং মাংস উৎপাদন সাড়ে ছয় গুন বৃদ্ধি পেয়েছে।

সেশন-১৪

গাভীর দুধ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ডেইরি ভ্যালু চেইন উন্নয়ন

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- দুধ দোহন পদ্ধতি
- দুধ সংরক্ষন পদ্ধতি
- ডেইরি ভ্যালু চেইন পদ্ধতি

প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ 'আদর্শ খাদ্য' দুধ। কিন্তু এ দুধ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাবে অতি সহজে দূষিত হয়ে পড়ে। দুধ দোহন পদ্ধতিই এর প্রধান কারণ এবং দোহনের সময়ই অসংখ্য ক্ষতিকর জীবাণু দুধে ঢুকে পড়ে। দুধে জীবাণু এত দ্রুত বৃদ্ধি পায় যে দুধের পুষ্টিমান অতি সহজেই নষ্ট করে ফেলে। তাই দুধ দোহনের সময় যত বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করা যায় তত ভাল মানসম্মত দুধ পাওয়া যায়।

দুধ দোহন (Milking) ঃ

যে প্রক্রিয়া বা কৌশলের মাধ্যমে গাভীর ওলান থেকে দুধ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে তাকে দুধ দোহন বলে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে সঠিকভাবে গাভী থেকে দ্রুত দুধ দোহন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে করে গাভী স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

দুধ দোহনের সময় (Time of milking) ঃ নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী প্রতিদিন দু'বার বা তিনবার দুধ দোহন করা উচিত। যখন তখন দুধ দোহন করলে দুধ উৎপাদন কমে যায়।

দুধ দোহন ক্রম (Milking order) ঃ কোনো দলে একের অধিক গাভী থাকলে নিচের ক্রম অনুযায়ী দুধ দোহন করা উচিত।

১ম- ম্যাস্টাইটিস রোগমুক্ত অল্প বয়স্ক গাভী। ২য়- ম্যাস্টাইটিস রোগমুক্ত বয়স্ক গাভী।

৩য়-যে সমস্ত গাভীর পূর্বে ম্যাস্টাইটিস রোগ হয়েছিলো কিন্তু তারপর অনেকদিন পর্যন্ত ম্যাস্টাইটিস রোগের কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি

দুধ দোহনের বিভিন্ন ধাপ (Steps for milking) ঃ

সঠিকভাবে দুধ দোহন সম্পন্ন করার জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হয়–

ধাপ-১. গাভী এবং দোহনকারীকে প্রস্তুত করা (Preparing the cow and milker) ঃ

দোহনকারী ও যে গাভীর দুধ সংগ্রহ করা হবে এদের মধ্যে পারস্পরিক পছন্দ থাকা উচিত। দুধ দোহনের পূর্বে কখনোই গাভীকে বিরক্ত করা উচিত নয় অথবা আঘাত করা উচিত নয়। দোহনের পূর্বে গাভীর ওলান এবং বাঁট অ্যান্টিসেপ্টিক লোশন অথবা নিম-পাতার গরম পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে । এরপর **দোহনকারীকে তার হাত সাবান পানি দিয়ে ধুতে হবে এবং দোহনের জন্য পৃথক** পরিষ্কার কাপড় পরিধান করতে হবে, তোয়ালে বা টুপি দিয়ে চুল ঢেকে রাখতে হবে এবং প্রতিদিন নখ কাটতে হবে। দুধ দোহনের সময় দোহনকারীর যদি কোনো বদভ্যাস যেমন– মুখ থেকে থুতু ফেলা, নাক ঝাড়া এমনকি দোহনের সময় কথা বলা ইত্যাদি থাকে তাহলে ঐ দোহনকারীকে দিয়ে দুধ দোহন করানো উচিত নয়।

ধাপ-২. পরিষ্কার তৈজসপত্র ব্যবহার করা (Use of clean utensils) ঃ

দুধ সংগ্রহরে জন্য প্লাস্টিক বা লোহার বালতির পরিবর্তে গম্বুজ আকৃতির ঢাকনাসহ স্বাস্থ্যসম্মত হাতাওয়ালা স্টেইনলেস স্টিলের বালতি ব্যবহার করা উচিত। প্রত্যেকবার দুধ দোহনের পর দুধের পাত্র প্রথমে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং পরে ব্রাশ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুতে হবে। পরবর্তী দোহনের পূর্ব পর্যন্ত র‌্যাকে পাত্রগুলো উপুড় করে সাজিয়ে রাখতে হবে।'

ধাপ-৩. **মশামাছির আক্রমণ থেকে গাভীকে মুক্ত রাখা (Keep Cows Free from Flies etc.) ঃ**

দোহনের সময় মশা মাছি বা কোনো বিকট শব্দের ফলে গাভী যেন বিরক্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ধাপ-৪. **গাভীকে উদ্দীপিত করা (Stimulation of Cows) ঃ**

বাছুরের সাহায্যে গাভীর বাঁট চুষে অথবা দোহনকারী কর্তৃক ওলান ম্যাসেজ করে গাভীকে উদ্দীপিত করতে হবে। দোহন করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, দুধ যেনো সম্পূর্ণভাবে দোহন করা হয়।

ধাপ-৫. **দোহনের সময় খাওয়ানো (Feeding During Milking) ঃ** দুধ দোহনের সময় গাভীকে ব্যস্ত রাখার উদ্দেশ্যে অল্প পরিমাণ দানাদার মিশ্রণ খাওয়ানো ভালো। এতে করে গাভী খেতে ব্যস্ত থাকে এবং সহজে দুধ দোহন করা যায়।

স্ট্রিপ কাপ ব্যবহার করা (Using Strip Cup) ঃ গাভী ম্যাস্টাইটিস রোগে আক্রান্ত কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য স্ট্রিপ কাপ ব্যবহার করা হয়। দোহনের শুরুতেই প্রতিটি বাট থেকে এক থেকে দুই ফোঁটা দুধ স্ট্রিপ কাপে নেয়া হয়। এতে করে দুধে যদি কোনো অস্বাভাবিকতা থাকে তবে তা দোহনকারী বুঝতে পারে এবং পাশাপাশি বাঁটে কোনো ময়লা থাকলে তা বের হয়ে আসে।

সাবান দিয়ে হাত পরিস্কার করা

দুধের পাত্র পরিস্কার করা

গাভীর ওলান ও বাট পরিস্কার করা

দুধ দোহন শুরু করা

দুধ দোহন পদ্ধতি **(Milking Procedure) ঃ**

দুধ দোহন হল দুধ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দুধ দোহন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দুগ্ধগ্রন্থি হতে দুধ নিঃসরণ করা হয়, যা হাত দ্বারা অথবা মেশিনের সাহায্যে করা যায়।

দুধ দোহনের দুটো পদ্ধতি রয়েছে–
১. হাত দিয়ে দুধ দোহন (Hand Milking)   ২. যন্ত্রের সাহায্যে দুধ দোহন (Machine Milking)
হাত দিয়ে দুধ দোহন (Hand Milking) ঃ

মূলনীতি ঃ হাতের সাহায্যে দুধের বাঁটের উপর চাপ প্রয়োগ করলে ওলানের ভিতরের দুধের উপর চাপ পড়ে।যখন চাপ অপসারণ করা হয় তখন ওলানের দুধ বাঁটে চলে আসে। আবার যখন বাঁটে চাপ দেয়া হয় তখনএকই সাথে দুধ নিচের পাত্রে জমা হয় এবং ওলানের ভিতরও চাপ পড়ে। এভাবে দুধ দোহন প্রক্রিয়া চলতেথাকে। হাত দ্বারা দুধ দোহন তিনভাবে হতে পারে-

(ক) পূর্ণ হস্ত দোহন (খ) নোড দ্বারা দোহন (গ) দুই আঙ্গুল দ্বারা দোহন

(ক) পূর্ণ হস্ত দোহন ঃ যে সমস্ত গাভীর ওলানের গঠন ভাল এবং বাঁটগুলি পরিমিত আকারের ধরা হয়যাতে ছোট আঙ্গুলের অগ্রভাগ মুক্ত থাকে। এভাবে বাঁট ধরে বার বার মুঠো খোলা এবং বন্ধের মাধ্যমে দুধদোহন করতে হয়।

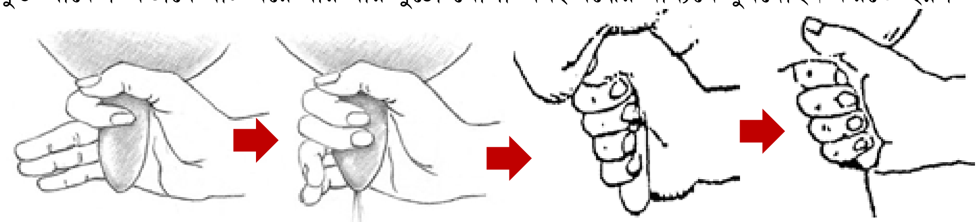

(খ) নোড দ্বারা দোহন ঃ যে সমস্ত গাভীর বাঁট মোটা ও মাংসল, সে সমস্ত গাভী দোহনের জন্য এ পদ্ধতি উপযুক্ত। এ পদ্ধতিতে

বৃদ্ধাঙ্গুলির অর্ধভাগ এবং প্রথম আঙ্গুল দ্বারা বাঁটকে এমনভাবে ধরা হয় যাতে বৃদ্ধাঙ্গুলিরঅগ্রভাগ দিয়ে বাঁটে চাপ প্রয়োগ করা যায়। এভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা বার বার চাপ প্রয়োগ করার মাধ্যমে দুধদোহন করতে হয়।

(গ) দুই আঙ্গুল দ্বারা দোহন ঃ যে সমস্ত গাভীর বাঁট ছোট, সে সমস্ত গাভী এ পদ্ধতিতে দোহনের জন্য উপযুক্ত। এ পদ্ধতিতে বৃদ্ধাঙ্গুল এবং প্রথম আঙ্গুল এর অগ্রভাগ দিয়ে বাঁট ধরা হয়। দু আঙ্গুল দিয়ে চাপ প্রয়োগসহ উপরে-নিচে করে দুধ দোহন করতে হয়।

২. যন্ত্রের সাহায্যে দুধ দোহন (Machine milking) ঃ

সাধারণত বড় বড় খামারে যেখানে দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা অনেক বেশি থাকে সেখানে একসংগে অনেকগুলো গাভীকে দোহনের জন্য দুধ দোহন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যন্ত্রের সাহায্যে খুব সহজে এবং অল্প পরিশ্রমে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে দুধ দোহন করা সম্ভব হয়।

একটি দুধ দোহন যন্ত্রে সাধারণত যে অংশগুলো থাকে (চিত্র-১)-

১. ভ্যাকুয়াম পাম্প ২. ভ্যাকুয়াম ট্যাংক ৩. ভ্যাকুয়াম লাইন ৪. রেগুলেটর ৫.পালসেটর ৬. মিল্ক পাইপ ৭. এয়ার পাইপ ৮.টিট কাপ ৯. দুধ সংগ্রহ পাত্র

যন্ত্রের সাহায্যে দুধ দোহন পদ্ধতিতে দোহনের সময় হলে গাভীর বাঁটে যন্ত্রের টিট কাপ লাগিয়ে দিয়ে দোহন যন্ত্রটি চালু করতে হবে। (চিত্র-৩) ভ্যাকুয়াম পাম্প কর্তৃক সৃষ্ট ভ্যাকুয়াম পালসেটরের মাধ্যমে টিট কাপ শেল ও টিট কাপ লাইনারের মধ্যে শূন্যতার সৃষ্টি করে। ফলে ওলান থেকে দুধ এসে বাঁটে জমা হয় (চিত্র-৪)। আবার টিট কাপ সেল ও লাইনারের মধ্যে বাতাস ঢুকিয়ে স্ফীতির সৃষ্টি করলে বাঁটের উপর চাপ পড়ে এবং বাঁটে রক্ষিত দুধ যন্ত্রের মিল্ক পাইপ দিয়ে দুধ সংগ্রহ পাত্রে এসে জমা হয় (চিত্র-৪)।

দুধ দূষণের কারণ ঃ

দুধে ক্ষতিকর জীবানু সংক্রমনের ফলে দুধ দূষিত হয়। দুধে জীবাণু দুইভাবে প্রবেশ করতে পারে। প্রথমত: গাভী থেকে। দ্বিতীয়ত: পরিচর্যাকারী/রোগাক্রান্ত মানুষ থেকে।

গাভী থেকে ঃ

১) ওলানের রোগ জীবানু থেকে দুধে জীবানু সংক্রমিত হতে পারে।

২) বাটের আলসার বা ঘাঁ হতে দুধ দূষিত হতে পারে।

৩) গাভীর মল-মূত্র বা অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ দ্বারা দুধে জীবাণু ছড়াতে পারে।

রোগাক্রান্ত মানুষ বা পরিচর্যাকারী থেকে ঃ

১) দুধ দোহন কালে বা দুধ পরিবহণ করার সময় দুধ জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে।

২) দোহনকারীর হাত অপরিস্কার থাকলে অথবা হাতের নখ কাটা না থাকলে নখের ময়লা দ্বারা দুধ জীবাণু সংক্রমিত হতে পারে।

৩) দুধ দোহনকালে যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র পরিস্কার পরিচ্ছন্ন না থাকলে পরোক্ষভাবে দুধে জীবাণু প্রবেশ করতে পারে।

৪) দূষিত পানিদ্বারা দুধ দোহন যন্ত্রপাতি বা দোহনকারীর হাত পরিস্কার করলে সেই পানি থেকে দুধে জীবাণু প্রবেশ করতে পারে।

৫) দুধ সংগ্রহের সময় দুধের পাত্র ঢেকে না রাখলে বাহির রোগ জীবাণু দুধে প্রবেশ করতে পারে।

৬) মাছি বা পোকা মাকরের মাধ্যমে দুধে জীবাণু প্রবেশ করতে পারে।

৭) দুধকে উপযুক্তভাবে সংরক্ষণ করা না হলে সহজেই দুধ জীবানু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে।

দুধ সংরক্ষন, শীতলীকরণ ঃ

দুধ সংরক্ষন ঃ

সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দুধকে খাদ্যোপযোগী এবং পচনমুক্ত রাখার প্রক্রিয়াকে দুধ সংরক্ষণ বলে। দুধ দোহনের পর যত দ্রুত সম্ভব তা শীতলীকরণ করা উচিৎ এবং প্রক্রিজাতকরনের পূর্ব সময় পর্যন্ত তা যত ঠান্ডা সম্ভব সে তাপমাত্রায় রাখা উচিৎ। শীতলীকরনের জন্য সবচেয়ে ভাল তাপমাত্রা হচ্ছে- ৪$^{\circ}$ সে.গ্রে. অথবা তার নীচে।

গুরুত্বপূর্ণ শীতলীকরণ পদ্ধতিগুলো হচ্ছে-

১. দুধ সূর্য এর আলোতে না রেখে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখা
২. আলো বাতাস পূর্ণ স্থানে রাখা
৩. বরফ দিয়ে ঢেকে রাখা।

শীতলীকরণ যন্ত্রপাতিগুলো হচ্ছে-

১. কম পরিমান দুধের জন্য প্রচলিত ফ্রিজ
২. বাস্পায়ীত কয়লাযুক্ত শীতলীকরণ যন্ত্র
৩. সারফেস কুলার

দুধ সংরক্ষণের লাকটোপারঅক্সিডেস পদ্ধতি-

১. এটি একটি নিরাপদ পদ্ধতি।
২. প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিটে দুধ নিয়ে যেতে যখন অনেক সময় লাগে তখন এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
৩. শীতলীকরণ সুবিধা যেখানে নেই সেখানে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা।
৪. যেখান থেকে দুধ সংগ্রহ করা হয় সেখানে প্রশিক্ষিত জনবল দরকার।
৫. লাকটোপারঅক্সিডেস এক ধরনের এনজাইম যা দুধ নষ্ট করার জীবাণু-এর বংশবিস্তার ধীর করে দেয়।
৬. এর কার্যক্ষমতা তাপমাত্রা এর উপর নির্ভর করে। তবে ৩০° সে. তাপমাত্রায় এটা দুধকে ৭-৮ ঘণ্টা পর্যন্ত ভাল রাখে।

প্রক্রিয়াতকরন কারখানায় দুধ পরিবহণ পদ্ধতি

ডেইরি ভ্যালু চেইন উন্নয়ন ঃ

ভ্যালু (Value) ঃ ভ্যালু হচ্ছে পণ্য বা সেবার গুণগতমান (Quality), অনন্যতা (Exclusivity), নির্ভরযোগ্যতা (Reliability), সুবিধা (Convenience) ইত্যাদি। ভ্যালু মূল্যায়ণ করা হয় পণ্যের কার্য ক্ষমতা, সরবরাহের গতি, বিক্রয় পরবর্তী সেবা এবং ব্যয়। একটি পণ্য বা সেবা থেকে ক্রেতার প্রত্যাশা এবং সেই পণ্য বা সেবার জন্য ক্রেতার ব্যয় এ দুয়ের পার্থক্য হল ভ্যালু (Value)

ভ্যালু চেইন (Value Chain) ঃ কাঁচামাল সংগ্রহ থেকে শুরু করে চূড়ান্ত ভোক্তার নিকট পণ্য/সেবা পৌঁছানো পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে যখন ভ্যালু সংযোজিত হয় তখন তাকে ভ্যালু চেইন বলে

মূল্য সংযোজন (Value Addition) ঃ

বাছাইকরণ (Sorting), গ্রেডিং, মোড়কীকরণ (Packaging) এবং হিমাগারে সংরক্ষন ইত্যাদির ফলে পণ্যের উপর ভ্যালু সংযোজিত হয় তখন তাকে ভ্যালু চেইন বলে। যদি ভ্যালু সংযোজিত না করা হয় তবে তাকে সাপ্লাই চেইন বলা হবে।

দুধ হতে সাধারনত: যেসব ভ্যালু এডেড পণ্য তৈরি করা হয়ে থাকে তা হলো-দই, ছানা, মিষ্টি, ঘি, মাঠা, মাখন, পনির ইত্যাদি ঃ

ডেইরি ভ্যালু চেইন উন্নয়ন ধাপ

মূল্য সংযোজিত দুগ্ধজাত পণ্যসামগ্রী

সেশন-১৫

গবাদিপশুর খামারে প্রাণি সনাক্তকরণ পদ্ধতি এবং রেকর্ড সংরক্ষণ

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- রেকর্ড সম্পর্কে ধারণা
- খামারে রেকর্ড সংরক্ষনে সুবিধা
- প্রাণি সনাক্তকরণের পদ্ধতি ও রেকর্ড পরিচিতি
- একটি আদর্শ দুগ্ধ খামারের রেকর্ড সংরক্ষণ পদ্ধতি
- রেকর্ড সংরক্ষনে লাইভস্টক ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার এর ব্যবহার

রেকর্ড ঃ

রেকর্ড বলতে নির্দিষ্ট তথ্যাবলী ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষণ করা বুঝায়। রেকর্ড হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাউপাদানের ডকুমেন্টেশন বা সংরক্ষণ।

প্রাণিসম্পদ খামারের রেকর্ড সংরক্ষনের গুরুত্ব ঃ

রেকর্ড রক্ষনাক্ষেণ ভাল প্রাণিসম্পদ ব্যবসা পরিচালনার একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। কোনও লিখিত রেকর্ড না থাকলে, কৃষকদের তাদের খামার পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তাদের স্মৃতির উপর নির্ভর করতে হয়। তবে, স্মৃতিগুলি কয়েক দিন, মাস বা বছর পরে হারিয়ে যেতে পারে। যা খামার ব্যবস্থাপনায় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

খামারে রেকর্ড সংরক্ষনের সুবিধা ঃ

- অতীতের রেকর্ড থেকে প্রাণিদের মূল্যায়নের জন্য ভিত্তি তৈরী করে তাই প্রাণি নির্বাচন এবং কালিংয়ে/বাছাই এ সহায়তা করে।
- বংশবৃদ্ধি এবং পশুর ইতিহাস রেকর্ড তৈরীতে সহায়তা করে ট্রেসেবিলিটি পূর্ব পুরুষ থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রাণি সনাক্ত করতে সহায়তা করে।
- পূর্ববর্তী রেকর্ডগুলি মূল্যায়ন করতে এবং পরবর্তীতে আরও ভাল প্রজনন পরিকল্পনা ডিজাইন করতে সহায়তা করে যাঁড়ের বংশ পরম্পরায় পরীক্ষা করতে সহায়তা করে।
- খাদ্য সরবরাহের ব্যয় বিশ্লেষণে সহায়তা করে। সুতরাং সর্বোত্তম উৎপাদনের জন্য খাওয়ানোর কৌশলগুলি তৈরী করতে সহায়তা করে।

  অস্বাস্থ্যকর অবস্থা বা পশুর রোগের অবস্থা সনাক্ত করতে সহায়তা করে যা দেহের ওজন হ্রাস করে, দুধের উৎপাদন হ্রাস বৃদ্ধির তথ্য প্রদান করে।
- অতীতের রোগবালাই খুঁজে পেতে এবং সময়সীমার আগে টিকা প্রদান নিশ্চিত করে।
- ক্রয় ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ মূল্য নির্ধারণে সহায়তা করে।
- পশুর সামগ্রিক উন্নত তদারকি ও পরিচালনায় সহায়তা করে।
- দুগ্ধ খামারের আয় এবং ব্যয় (অর্থনীতি) নির্ধারণে সহায়তা করে।
- দুধ উৎপাদনের ব্যয় নির্ধারণে সহায়তা করে।
- অন্যান্য খামারগুলির সাথে শ্রমের এবং পশুর দক্ষতার তুলনা করতে সহায়ক।
- কখন কোন প্রাণিকে প্রজনন করা হয়েছে তা নিশ্চিত করে।
- টিবি ব্রুসেলোসিস সহ অন্যান্য জুনেটিক রোগ নিয়ন্ত্রণ ও সনাক্তকরণে সহায়তা করে।
- প্রজনন জেনেটিক্স এবং বংশানুক্রমিক উন্নয়ন সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।
- বার্ষিক লাভ/ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ এবং খামারের জন্য ভবিষ্যতের পরিকল্পনা/দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন বছরে প্রাণির পারফরম্যান্সগুলির সাথে পারস্পরিক তুলনা করা যায়।

প্রাণি শনাক্তকরণের পদ্ধতি ঃ

১. **ইয়ার ট্যাগিং (Ear Tagging)** ঃ ইয়ার ট্যাগ যন্ত্রের মাধ্যমে কান ছিদ্র করে নাম্বার ট্যাগ লাগানো হয়।

২. **ইয়ার টেট্টোইং (Ear Tattoing)** ঃ কানে রঙ দিয়ে স্থায়ী সংখ্যা লিখা হয় যা সচারাচর ০০১ থেকে ৯৯৯ নম্বর বসানো যায়।

৩. **নাম্বার ট্যাগিং (Number Tagging)** ঃ গলায় চেইন পরিয়ে নির্দিষ্ট মেটালিক ট্যাগ নাম্বার লাগিয়ে দেওয়া হয়।

৪. **ব্রান্ডিং (Branding)** ঃ দুধাল বাছুর কে মেটালিক নাম্বার উত্তপ্ত করে চামড়ার উপর নির্দিষ্ট চিহ্ন দেওয়া হয়। যা চামড়ার উপর স্থায়ী দাগ পড়ে।

৫. **এয়ার নোচিং (Ear Notching)** ঃ কানের পাশ কেটে দিয়ে প্রাণিকে চিহ্নিত করা হয়। শুকুর, গাধাকে এরূপ করা হয়।

চিত্র-১ ইয়ার ট্যাগিং

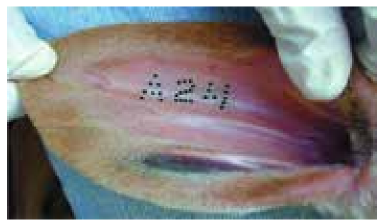

চিত্র-২ ইয়ার টেট্রোইং

চিত্র-৩ নাম্বার ট্যাগিং

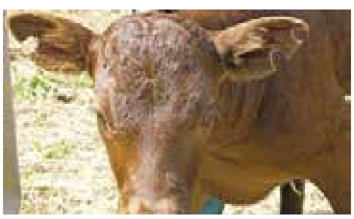

চিত্র-৪ এয়ার নোচিং

চিত্র-৫ ব্রান্ডিং

চিত্র-৬ কম্পিউটার রেকর্ডিং

আদর্শ দুগ্ধ খামারে রেকর্ড সংরক্ষণ ঃ

খামারে রেকর্ড সংরক্ষণ পদ্ধতি দুই ধরনের-

ক) ম্যানুয়েল পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতিতে রেকর্ড সংরক্ষণে রেজিষ্টার ব্যবহার করা হয়। রেজিষ্টারে খামার ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন রেজিষ্টার সংরক্ষণ করা হয় এবং হাতে লিখে রেজিষ্টারে নির্দিষ্ট ছকে তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়।

একটি আদর্শ দুগ্ধ খামারে যে সকল রেকর্ড সংরক্ষণ প্রয়োজন **(ম্যানুয়েল পদ্ধতি) ঃ**

১. গবাদিশুর রেকর্ড

ক্রমিক নং	গরুর বর্ণনা		গরুর লিঙ্গ	আইডি নম্বর	গরুর বয়স	গরুর নাম/ শনাক্তকরণ চিহ্ন	মন্তব্য
	জাত	প্রাপ্তিস্থান					

২. ব্রিডিং বা প্রজনন সংক্রান্ত রেকর্ড

গরুর নম্বর	ডাকে আসার তারিখ	প্রজননের তারিখ	ষাঁড়ের নম্বর/ জাত	প্রজননকারীর তথ্য		সম্ভাব্য বাচ্চা জন্মের তারিখ	মন্তব্য
				নাম ও ঠিকানা	মোবাইল নম্বর		

৩. কালভিং বা বাছুরের জন্মের রেকর্ড

ক্র. নং	গাভীর নম্বর	কালভিং বা বাচ্চা জন্মের তারিখ	বাছুরের জাত	বাছুরের নম্বার	বাছুরের লিঙ্গ	জন্মের সময় বাছুরের ওজন	মন্তব্য

৪. ফিডিং রেকর্ড বা দৈনিক খাবারের হিসাব রেকর্ড

ক্র. নং	তারিখ	গবাদিপশুর আইডি নম্বর	গরু প্রতি বরাদ্দকৃত সাইলেজ/সবুজ ঘাস(কেজি)			গরু প্রতি বরাদ্দকৃত দানাদার খাবার (কেজি)			গরু প্রতি বরাদ্দকৃত অন্যান্য খাদ্য উপাদান			মন্তব্য
			গ্রহণ	প্রদান	অবশিষ্ট্য	গ্রহণ	প্রদান	অবশিষ্ট্য	গ্রহণ	প্রদান	অবশিষ্ট্য	
মোট খাবারের পরিমাণ												

৫. ভ্যাকসিনেশন রেকর্ড

টিকার বিবরণ	প্রথম টিকা প্রদানের তারিখ	২য় বার টিকা প্রদানের তারিখ	৩য় বার টিকা প্রদানের তারিখ	৪র্থ বার টিকা প্রদানের তারিখ	৫ম বার টিকা প্রদানের তারিখ	মন্তব্য
ক্ষুরা রোগ (FMD)						
বাদলা (BQ)						
গলা ফুলা (HS)						
তড়কা (Anthrax)						
পিপিআর (PPR)						
রেবিস						
গোটপক্স/এলএসডি						
কৃমি নাশক	প্রথম বার	দ্বিতীয় বার	তৃতীয় বার	চতুর্থ বার	পঞ্চম বার	প্রতি তিন মাস পর পর

৬. প্রাণিস্বাস্থ্য রেকর্ড

<table>
<tr><td>প্রাণির নাম/আইডি/ ট্যাগ নাম্বার</td><td></td><td>চিকিৎসা তথ্য</td><td></td><td>রোগের বর্ণনা</td><td></td></tr>
<tr><td>প্রাণির ধরণ</td><td></td><td>রোগ নির্ণয়</td><td></td><td>চিকিৎসকের নাম</td><td></td></tr>
<tr><td>জাত/ব্রীড</td><td></td><td rowspan="4">চিকিৎসা</td><td rowspan="4"></td><td>ঠিকানা</td><td></td></tr>
<tr><td>ওজন</td><td></td><td>ফোন/ই-মেইল</td><td></td></tr>
<tr><td>লিঙ্গ</td><td></td><td colspan="2" rowspan="3">চিকিৎসকের স্বাক্ষর ও তারিখ</td></tr>
<tr><td>বর্ণনা</td><td></td></tr>
<tr><td>বীমা তথ্য/আইডি</td><td></td><td>ঔষধের মূল্য</td><td></td></tr>
</table>

৭. প্রাণিমৃত্যু রেকর্ড

ক্রমিক নং	গবাদি পশুর আইডি নম্বর	মৃত্যুর তারিখ	মৃত্যুর সম্ভাব্য কারণ/লক্ষণ	লিঙ্গ	বয়স	ময়নাতদন্তের রিপোর্ট

৮. সেলস রেকর্ড

ক্রমিক নং	প্রাণির বর্ণনা				বিক্রয়ের কারণ	বিক্রয় মূল্য	বার্ষিক বিক্রয়ের তথ্য	মন্তব্য
	আইডি নম্বর	লিঙ্গ	বয়স	ওজন				

৯. দুধ উৎপাদনের রেকর্ড

দৈনিক দুধ উৎপাদন পরিমান (লিঃ)

মাসের নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	.	.	.	.	.	.	.	.	২৯	৩০	৩১	মোট দুধ	গড় প্রতিদিন	মন্তব্য
	বার্ষিক দুধ উৎপাদন:																							
	মোট দুধ উৎপাদনের দিন:																							

১০. জনবল রেকর্ড

ক্রমিক নং	কর্মচারীর পদবী	নিয়োগের তারিখ	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা	বয়স	মোবাইল নম্বর	মাসিক বেতন	মন্তব্য

১১. বার্ষিক আয় ব্যয় রেকর্ড

বার্ষিক আয়ের খাত									
ক	১	দুধ বিক্রয়							
	২	গাভী/বিক্রয়							
	৩	বাছুর/বকনা/ ষাড় বিক্রয়							
	৪	বার্ষিক মোট বিক্রয়							
বার্ষিক ব্যয়ের খাত									
খ	১	বার্ষিক খাদ্য খরচ							
	২	শ্রমিক/কর্মচারীর বেতন							
	৩	বিদ্যুৎ খরচ							
	৪	ভ্যাকসিন ও চিকিৎসা খরচ							
	৫	অন্যান্য খরচ							
		মোট খরচ							
আয় (ক) - ব্যয় (খ) = নীট লাভ									

খ) খামারে রেকর্ড সংরক্ষনে ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহার ঃ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্তমানে খামার ব্যবস্থাপনায় Livestock Management software এর মাধ্যমে কম্পিউটারাইজড রের্কডিং পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। Livestock Management software এমন একটি সিস্টেম যা জন্ম থেকে বিক্রি পর্যন্ত সমস্ত পশুপালন রেকর্ড সংরক্ষন করতে এবং অবস্থান ট্র্যাক করতে খামার ব্যবস্থাপক বা কৃষকদের সহায়তা করে। এটি একটি প্রাণির সমস্ত ঘটনা রেকর্ড করা পাশাপাশি প্রাণির জীবদ্দশায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে গবাদিপশুর শারীরিক অবস্থার পাশাপাশি গাভীর হিটে আসা, গর্ভধারণের তথ্য জানা যাবে।

গবাদিপশুর রেকর্ড সংরক্ষনের খামারের বিস্তারিত তথ্যাবলীর ছক

খামার সনাক্তকরণ কোড (Tracibility Code)

বিভাগ: -------------------------জেলা: ----------উপজেলা: ---------------খামার কোড:----------------

খামার নিবন্ধন তথ্য

সরকারী নিবন্ধন নম্বর	
নিবন্ধনের তারিখ	
নিবন্ধনের মেয়াদ	

খামারের সাধারণ তথ্যবলী

খামারের নাম			
খামারের মালিকের নাম			
পিতার নাম			
মাতার নাম			
গ্রাম			
ডাকঘর			
উপজেলা			
জেলা			
মোবাইল নম্বর			
খামারের অবস্থান			
জিপিএস অবস্থান (GPS Location)			
গ্রাম/মৌজা			
ইউনিয়ন			
উপজেলা			
জেলা			
মালিকানা	নিজস্ব	ইজারা স্বল্পমেয়াদী	ভাড়া
খামারের মোট আয়তন শেড ও খালি জায়গাসহ (শতাংশ)			
শেড সমূহের সংখ্যা			
শেড সমূহের অবস্থান	উত্তর-দক্ষিণ	পূর্ব-পশ্চিম	
শেড থেকে শেডের দূরত্ব (ফুট)			
শেড সমূহের আয়তন (বর্গফুট)	১ম শেড	২য় শেড	৩য় শেড

সেশন-১৬

গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রযুক্তি এবং গো খাদ্য হিসেবে ইউএমএস তৈরী ও ব্যবহার

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের উদ্দেশ্য
- হৃষ্টপুষ্টকরণে গরু নির্বাচন
- হৃষ্টপুষ্টকরণে গরুর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা
- হৃষ্টপুষ্টকরণে গরুর খাদ্য ব্যবস্থাপনা
- ইউএমএস তৈরী পদ্ধতি
- ইউএমএস খাওয়ানোর নিয়ম

গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ ঃ

গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ বলতে কিছু সংখ্যক অপুষ্টি জনিত স্বাস্থ্যহীন গরু বা বাড়ন্ত বয়সের গরুকে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় উন্নত সুষম খাবার সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে স্বাস্থ্যবান গরুতে রুপান্তর করে বাজারজাত করাকে বুঝায়।

গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের উদ্দেশ্য ঃ

- মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে আমিষের চাহিদা পূরণ।
- প্রাণিসম্পদ বিষয়ে উদ্যোক্তা তৈরি করা।
- বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য চামড়া শিল্পের সমৃদ্ধি।
- জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা ও বেকার সমস্যার সমাধান করা।
- জৈব সার সহজলভ্য করা।
- বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে গোবর থেকে গ্যাস আহরণ করে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- কর্মসূচির সম্প্রসারণের মাধ্যমে অধিক জনগণকে এ কাজে উৎসাহিত করে তাদের আর্থ- সামাজিক অবস্থার উন্নতি করা।

গরু হৃষ্টপুষ্টকরনের সুবিধা সমূহ ঃ

- কম মূলধন ও কম জায়গার প্রয়োজন হয়।
- অল্প সময়ের (৪-৬ মাসের) মধ্যে গরু হৃষ্টপুষ্ট করে অধিক মূল্যে বাজারে বিক্রয় করা যায় অর্থাৎ আর্থিক মুনাফা অর্জন করা যায়।
- খুব অল্প সময়ের মধ্যে লাভসহ মূলধন ফেরৎ পাওয়া যায়।
- বেকার যুবক ও মহিলাদের কর্মসংস্থানে সুযোগ বেশি।
- বসতভিটা আছে এমন সকল পরিবার স্বল্প বিনিয়োগ করে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে।
- এ কার্যক্রমে লোকসানের ঝুঁকি কম থাকে।
- বাড়ন্ত গরুর রোগ-ব্যাধির প্রকোপ খুব কম থাকে, ফলে আর্থিক ক্ষতির সম্ভবনা খুব কম।
- স্থানীয় বাজার-হাট থেকে অনায়াসে প্রাণি ক্রয় করে প্রকল্প শুরু করা যায়।
- স্থানীয় ভাবে খাদ্যের সাথে বাড়ির উচ্ছিষ্ঠসদ্ব্যবহার হয়।

গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্প গ্রহণে পূর্ব বিবেচ্য বিষয় ঃ

গরু হৃষ্টপুষ্ট করার পূর্বে নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে ঃ

মূলধন ঃ

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে কত টাকার প্রয়োজন হতে পারে এবং এই টাকার উৎস কি হতে পারে, তা পূর্বেই ঠিক করতে হবে। মূলধন পুরোপুরি সংগ্রহ না করে কার্যক্রম শুরু করলে প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাকে।

গরু বিক্রয়ের হাট ঃ

সাধারণতঃ হাট-বাজার থাকলেই উহাকে হৃষ্টপুষ্ট করা গরু বিক্রয়ের হাট আছে বুঝায় না। এলাকায় কতটি স্থানে কতটি গরু প্রতিদিন/প্রতি সপ্তাহে জবাই করা হয় তা একটি জরীপের মাধ্যমে জানতে হবে। ক্রেতারা কি পরিমাণ গরুর মাংস খায়, সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ কত দরে গরুর মাংস বিক্রয় হয় তাও জানতে হবে। গরুটি বিক্রয়ের জন্য হাটে নিয়ে যেতে হবে নাকি ক্রেতা এসে নিয়ে যাবে সে সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।

পশুখাদ্য সামগ্রীর প্রাপ্যতা ঃ

গবাদিপশু যেসকল খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করে সে সম্পর্কে যেমন পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে তেমনি খাদ্য দ্রব্যগুলি কোথায়, কতদূরে এবং কত দরে সংগ্রহ করা যাবে তা জানতে হবে। বছরের সব সময় পাওয়া যাবে কিনা এবং একবারে কিনে রাখার মত পরিমাণ পাওয়া যাবে কিনা তা জানতে হবে।

হৃষ্টপুষ্টকরণে গরু নির্বাচন ও ক্রয় ঃ

হৃষ্টপুষ্টকরণ বা বীফ ফ্যাটেনিং কর্মসূচির জন্য গরু মোটাতাজা করার জন্য দেশী জাতের ষাঁড়, শাহীওয়াল সংকর ও ফ্রিজিয়ান সংকর জাতের ষাঁড় ক্রয় করা বাঞ্চনীয়। ২-৩ বৎসরের এঁড়ে বাছুর বাষাঁড় (দুই/চার দাঁতের) গরু ক্রয় করা লাভজনক। স্বাস্থ্যহীন বলদ গরু ক্রয় করা যেতে পারে। সাধারণত ২-৩ বছরের সংকর জাতের ষাঁড় গরুর বৃদ্ধির হার অন্যান্য বয়সের তুলনায় বেশি হওয়ায় হৃষ্টপুষ্টকরণের ক্ষেত্রে এ ধরণের বয়সের প্রাণি নির্বাচন করতে হয়।

হৃষ্টপুষ্ট করণে গবাদিপশু ক্রয় করার সময় নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো বিচার করে সতর্কতার সাথে প্রাণি নির্বাচন করতে হবে।

বৈশিষ্ট্যাবলী ঃ প্রাণিটির বংশ পরিচয় ভাল করে জেনে নিতে হবে। মাথা ও গলা খাটো এবং চওড়া হতে হবে। কপাল প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক। গায়ের চামড়া ঢিলে হবে। কাঁধ খুব পুরু ও মসৃণ। পিঠ চ্যাপ্টা, অনেকটা সমতল। কোমরের দুই পার্শ্ব প্রশস্থ ও পুরু। বুক প্রশস্ত ও বিস্তৃত হতে হবে। শরীরে হাড়ের আকার মোটা হতে হবে। সামনে পা দুইটি খাটো ও শক্ত সামর্থ হতে হবে। শিং খাটো ও মোটা হওয়া বাঞ্চনীয়। এঁড়ে/বলদ গরু হওয়া বাঞ্চনীয়। লেজ খাটো হতে হবে। স্বাভাবিক ভাবে প্রাণিটি শারিরীক রোগ- ত্রুটি মুক্ত হতে হবে। স্বাভাবিক ভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় প্রাণিটিকে একটি আয়তক্ষেত্রের মত হতে হবে। বদমেজাজী গরু ক্রয় করা উচিত নয়।

গরু ক্রয়ের উৎস ঃ গরু ক্রয়ের উৎস আগে থেকে ঠিক করতে হবে। যেমন-কোন খামার থেকে সংকর জাতের শুধু ষাঁড় বাছুর সংগ্রহ করা যেতে পারে। স্থানীয় কোন বাজার থেকেও দেশী বা সংকর জাতের ষাঁড় গরু ক্রয় করা যেতে পারে।

ক্রয়কৃত পশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও কৃমিমুক্তকরণ ঃ

- ক্রয়ের পর গরু কোন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত কিনা তা ভালোভাবে পরীক্ষা করে নিতে হবে।
- গোবর পরীক্ষা করে গরুকে কৃমিনাশক ঔষধ সেবনের মাধ্যমে কৃমিমুক্ত করতে হবে। কারণ আমাদের দেশের প্রায় ১০০% প্রাণি কৃমিতে আক্রান্ত হয় এ জন্য প্রাণি ক্রয় করার পর অবশ্যই কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে।
- ১ মাস পর পুনরায় কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে।

হৃষ্টপুষ্টকরনে গবাদিপশুকে প্রতিষেধক টিকা প্রদান ঃ

গরুকে কোন টিকা দেয়া না থাকলে ক্রয় করার ৭ দিন পর থেকে প্রয়োজনীয় টিকা ১৫ দিন পর পর দিতে হবে। যেসব টিকা প্রদান করতে হয় তা হচ্ছে- তড়কা, ক্ষুরা, বাদলা ও গলাফুলা। প্রকল্পের গরুকে কমপক্ষে ২টি টিকা তড়কা এবং ক্ষুরা টিকা অবশ্যই দেয়া উচিত।

হৃষ্টপুষ্টকরণে গবাদিপশুর খাদ্য সরবরাহ ঃ

হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য ক্রয়কৃত গরুকে দৈহিক ওজনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সুষম খাবার (আঁশ ও দানাদার) সরবরাহ করতে হবে।

গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ ঃ

ক্র.নং	উপকরণ	পরিমান (%)
১	ভূট্টা/গম ভাঙ্গা	২৫
২	গমের ভূসি/ডালের ভূষি (১ঃ১)	২০
৩	ধানের কুড়া	২০
৪	সরিষার খৈল/তিলের খৈল/নারিকেলের খৈল	২৫
৫	সয়ামিল	৫
৬	ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট	৩.২৫
৭	লবণ	১.৫
৮	ভিটামিন প্রিমিক্স	০.২৫

হৃষ্টপুষ্টকরণে গরুর খাদ্য সরবরাহ ঃ

১. দানাদার খাদ্য গরুর শরীরের ওজনের ১.২-১.৫%।
২. পানি গরুর শরীরের ওজনের ১২-১৫ %।
৩. রসালো আঁশ জাতীয় খাবার (কাঁচা ঘাস) গরুর দানাদার খাবারের ৪ গুন।
৪. শুকনো আঁশ জাতীয় খাবার গরুর শরীরের ওজনের ১%।
৫. ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র গরুর শরীরের ওজনের ১% ।

হৃষ্টপুষ্টকৃত গরু বাজারজাতকরণ ঃ

অধিক লাভে গরু বিক্রয় হৃষ্টপুষ্টকরণের একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে নচেৎ প্রাণির প্রকৃত মূল্য পাওয়া যাবে না। ফলে প্রকল্প ফলপ্রসূ হবে না। তাই যে অঞ্চলে হাট বাজারে বেশী দাম পাওয়া যায় সেই সব হাটে গরু গুলোকে বিক্রয় করতে হবে। এছাড়া আমাদের দেশের ঈদুল আজহার মৌসুমে বিক্রয় করলে এসব গরুর দাম বেশী পাওয়া যায়। এছাড়া মাংসের জন্য এসব গরুর চাহিদা আমাদের দেশে সব অঞ্চলে আছে তবে ঢাকা ও চট্টগ্রামে এঁড়ে বা বলদ গরুর চাহিদা ব্যাপক। তাই ঢাকা বা চট্টগ্রামে বিক্রয় করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে অথবা ঐ অঞ্চলের গরুর ব্যবসায়ী বা কসাইদের সাথে যোগাযোগ করে প্রকল্প খামারে তাদেরকে ডেকে এনে বিক্রয় করলে অধিক মুনাফা পাওয়া যাবে।

গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্পে বিনিয়োগ ও আয়-ব্যয়ের রেকর্ড সংরক্ষণ প্রো-ফরমা

ক্রঃ নং	গরু ক্রয়ের তাং	গরুর জাত	গরুর বয়স	ক্রয়ের সময় ওজন (কেজি)	ক্রয় মূল্য	খাদ্য গ্রহণ			খাদ্য বাবদ মোট খরচ	টিকা/চিকিৎসা বাবদ খরচ	সর্বমোট খরচ	বিক্রয় কালিন ওজন	গরু বিক্রয়ের তাং	কত দিন মোটাতাজা করা হয়েছে (সময়)	আয়		নীট মুনাফা
						দানাদার	খড়	কাঁচাঘাস							গরু	গোবর	

ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র (UMS) তৈরী এবং ব্যবহার।

আমাদের দেশের গবাদিপশুর প্রধান খাদ্য হল খড়। কিন্তু খড়ের পুষ্টিমান খুবই কম। তাই খড়ের পুষ্টিমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট দীর্ঘ গবেষণা ও কৃষক পর্যায়ে যাচাই করে দেশে প্রাপ্ত খড়, ইউরিয়া ও চিটাগুড়ের মিশ্রণে তৈরী করেছে ইউএমএস গো-খাদ্য প্রযুক্তি। এটি একটি পুষ্টি সমৃদ্ধ সুস্বাদু খাদ্য যা গরুকে প্রতিদিন শুকনা খড়ের পরিবর্তে চাহিদা মত খাওয়ানো যায়।

ইউএমএস তৈরীর পদ্ধতিঃ-

- ইউএমএস তৈরীর প্রথম শর্ত হল এর উপাদানগুলির অনুপাত সর্বদা সঠিক রাখতে হবে অর্থাৎ ১০০ ভাগ ইউএমএস এর শুষ্ক পদার্থের মধ্যে ৮২ ভাগ খড়, ১৫ ভাগ মোলাসেস এবং ৩ ভাগ ইউরিয়া থাকতে হবে।
- সহজ ভাষায় যতটুকু খড় মিশ্রিত করা হবে তার অর্ধেক পরিমাণ পানি, পানির অর্ধেক পরিমাণ চিটাগুড় (মোলাসেস) এবং প্রতি কেজি খড়ের জন্য ৩০ গ্রাম ইউরিয়া নিতে হবে।
- যেমন ১০ কেজি খড়ের জন্য ৫ লিটার পানি, ২.৫ কেজি মোলাসেস এবং ৩০০ গ্রাম (১০ x ৩০ গ্রাম) ইউরিয়া লাগবে।
- প্রথমে খড়, মোলাসেস ও ইউরিয়া পরিমাণ মেপে নিতে হবে।
- মোলাসেস ও ইউরিয়া ওজনের পর প্রয়োজন মত পরিস্কার পানিতে এমনভাবে মিশাতে হবে যাতে সম্পূর্ণ দ্রবণটুকু খড়ের সাথে মিশে সহজে মিশানো যায়। পানি বেশি হলে দ্রবণটুকু খড় শুষে নিতে পারবে না। আবার কম হলে দ্রবণ ছিটানো সমস্যা হবে।
- শুকনো খড়গুলিতে ৩-৪ ইঞ্চি পরিমান করে কেটে নিতে হবে। আস্ত খড় দিয়েও ইউএমএস তৈরী করা যায় এতে অপচয় বেশী হয়।
- এরপর শুকনো স্থানে বা পাকা মেঝেতে একটি বড় পলিথিন সমভাবে বিছিয়ে খড়গুলির চারভাগের একভাগ পলিথিনের উপর ভালোভাবে বিছিয়ে চারভাগের একভাগ ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবণটি আস্তে আস্তে ঝরণা বা হাত দিয়ে বিছানো খড়ের উপর সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে এবং সাথে সাথে খড়গুলিকে হাত বা বাঁশের কারি দিয়ে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিতে হবে যাতে দ্রবণগুলি খড় ভালোমত শুষে নেয়। এরপর পুনরায় অবশিষ্ট খড়ের তিনভাগের একভাগ দ্রবনমিশানো খড়ের উপর বিছাতে হবে এবং একই পদ্ধতিতে দ্রবণ মিশাতে হবে। একই প্রক্রিয়ায় অবশিষ্ট খড়গুলি স্তরে স্তরে সাজাতে হবে এবং ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবণ মিশিয়ে নিতে হবে। ওজন করা খড়ের সাথে পুরো দ্রবণ মিশিয়ে নিলে ইউএমএস তৈরী সম্পূর্ন হবে এবং গরুকে খাওয়ানোর উপযুক্ত হবে।

সঠিক ইউএমএস তৈরীর পরীক্ষা ঃ ইউএমএস সঠিকভাবে তৈরী হয়েছে কিনা তা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতকৃত ইউএমএস খড় হাতে মুঠোয় নিয়ে চাপ দিয়ে ছেড়ে দিলে হাতের তালুতে যদি ইউএমএম দ্রবণ তালু থেকে গড়িয়ে না পড়ে, তালুতে আঠা আঠা ভাবে লেগে থাকে, তখন বুঝতে হবে ইউএমএস সঠিকভাবে তৈরী হয়েছে। আর যদি দ্রবণ তালু থেকে গড়িয়ে পড়ে কিম্বা দ্রবণ তালুতে না লাগে তখন বুঝতে হবে ইউএমএস সঠিকভাবে তৈরী হয় নাই।

গবাদিপশুকে ইউএমএস সরবরাহ ঃ গবাদিপশুকে স্বাভাবিক খড়ের পাশাপাশি পরিমানমত প্রতিদিন ইউএমএম খাওয়াতে হবে। গবাদিপশুর দৈহিক ওজনের ১ভাগ হারে প্রতিদিন ইউএমএম খাওয়ানো যায়। ইউএমএস অন্য কোন খাদ্য যেমন অতিরিক্ত খড়, দানাদার বা পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো যাবে না।

ইউএমএস সংরক্ষণ ঃ ইউএমএম তৈরী করে তখনই গবাদিপশু (গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া) কে খাওয়ানো যায়। তবে ইউএমএস তৈরী করে ৩দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষণকালে ইউএমএম পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে বা পলিথিন ব্যাগেও রাখা যায় তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন ধুলাবালি বা পানি না লাগে।

ইউএমএস এর সুবিধা ঃ

- ইউএমএস তৈরী সহজ। একজন শ্রমিক অনায়াসে দৈনিক ৫০০-৬০০ কেজি ইউএমএস তৈরী করতে পারে।
- সকল বয়সের গরু ও মহিষ যথেষ্ট পরিমাণ এ খাদ্য গ্রহণ করতে পারে।
- গরু হৃষ্টপুষ্টকরণে এ খাদ্য সাফল্যজনক ভাবে ব্যবহার করা যায়।
- কৃষক তার দৈনিক চাহিদা অনুযায়ী ইউএমএস প্রস্তুত করে প্রতিদিন তার গরুকে খাওয়াতে পারে।

প্রযুক্তি ব্যবহারে সর্তকতাঃ অবশ্যই ইউএমএস তৈরী করার সময় ইউরিয়া, মোলাসেস, খড় ও পানির অনুপাত ঠিক রাখতে হবে। ইউরিয়ার মাত্রা কোন অবস্থাতেই বাড়ানো যাবে না। ইউএমএস এর গঠন পরিবর্তন করলে কাঙ্খিত ফল পাওয়া যাবে না।

সেশন-১৭

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ও ভেড়া পালন পদ্ধতি

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- ব্লাক বেংগল ছাগলের বৈশিষ্ট্য
- ছাগলের বাসস্থান নির্মান ও খাদ্য সরবরাহ
- ছাগল খামারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা
- ভেড়ার বাসস্থান নির্মান ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা
- ভেড়ার খামারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা
- ভেড়ার পশম কাটা বা শেয়ারিং
- ভেড়ার পশমের বাণিজ্যিক ব্যবহার

বাণিজ্যিকভাবে ছাগল পালনের ক্ষেত্রে ব্লাক বেংগল, যমুনাপাড়ি, বিটল, বারবারি, বোয়ার জাতের ছাগল আমাদের দেশের আবহাওয়ায় বেশ উপযোগী ও লাভজনক। তবে ব্লাক বেংগল ছাগলের বানিজ্যিক খামার বেশী লাভজনক।

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

১. ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের দেহ সাধারণত খাটো। উচ্চতা ১৬-২৪ ইঞ্চি।
২. এদের দেহ কালো লোম দ্বারা আবৃত। তবে খয়েরী বা সাদা বা এদের মিশ্রিত রংয়ের ছাগলও দেখা যায়।
৩. এদের কান ছোট, খাড়া ও ভূমির সমান্তরাল। এদের শিং ছোট, খাঁড়া ও কালো।
৪. ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের গড় দৈহিক ওজন ২০-৩০ কেজি। পাঁঠার ওজন ২৫-৪০ কেজি এবং ছাগীর ওজন ১৫-২৫ কেজি।
৫. ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের শারীরিক বৃদ্ধি অতি অল্প সময়ে ঘটে। ৭-৮ মাস বয়সে এরা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। ১৩-১৪ মাস বয়সে প্রথম বাচ্চা দেয়। বছরে এরা কমপক্ষে দুইবার বাচ্চা দেয়।
৬. এ জাতের ছাগল প্রতিবার ২-৪ টি বাচ্চা প্রসব করে।
৭. ব্ল্যাক বেঙ্গল খাসীর মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু। একটি ২০ কেজি ওজনের খাসী হতে গড়ে ১২ কেজি খাওয়ারযোগ্য মাংস পাওয়া যায়।
৮. ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের চামড়া অতি উন্নত মানের বিধায় বিশ্বব্যাপী এর কদর রয়েছে। একটি ২০ কেজি ওজনের ছাগল হতে গড়ে ১.২-১.৪ কেজি চামড়া পাওয়া যায়।

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের সুবিধা ঃ

সাধারণত ১২-১৫ মাস বয়সেপ্রথম বাচ্চা দেয় একটি ছাগী বছরে দু'বার বাচ্চাপ্রসব করলেও উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় ছাগী বছরে ২-৮ টি পর্যন্ত বাচ্চা পাওয়া যেতে পারে। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামডা একটি অতি মূল্যবান উপজাত। দেখা গেছে, সেমি-ইন্টেনসিভ পদ্ধতিতে ১০টি ছাগীর খামার থেকে ১ম বছরে ১ লক্ষ টাকা, ২য় বছরে ২.৫ লক্ষ এবং ৩য় বছরে ৩.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করা সম্ভব।

আধা নিবিড় পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ঃ

- এ পদ্ধতিতে ছাগলকে দিনের বেলায় খামারের নিজস্ব ভূমিতে চরানো হয় এবং রাতের বেলায় ঘরে আবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়।
- ছাগলের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য দানাদার খাদ্য ও কাঁচা ঘাস সরবরাহ করা হয়।
- এই পদ্ধতিতে পালন করলে ছাগল কর্তৃক অন্যের ক্ষেতের ক্ষতিসাধনের সম্ভাবনা থাকে না বলে বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী।
- খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার পেছনে বেশী বিনিয়োগ করা হয় বলে এই পদ্ধতিতে উৎপাদন আশাব্যঞ্জক হয় ।

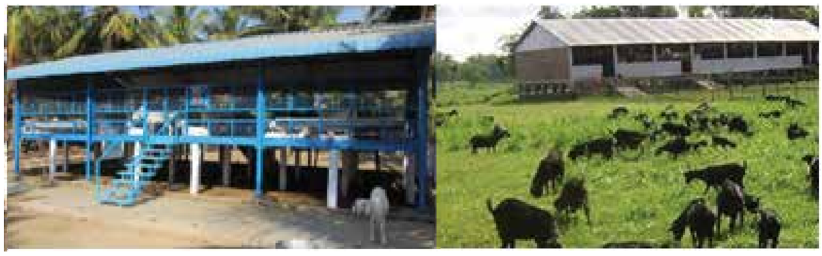

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের ঘর/বাসস্থান নির্মাণ ঃ

ক) পূর্ব পশ্চিমে লম্বালম্বী, দক্ষিণ দিক খোলা ঘর ছাগল পালনের জন্য উপযোগী। ছাগল খামারের স্থান নির্বাচনে অবশ্যই অপেক্ষাকৃত উঁচু এবং উত্তম পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

খ) প্রতিটি পূর্ণ বয়স্ক ছাগলের জন্য ৮-১০ বর্গফুট জায়গা প্রয়োজন। প্রতিটি বাড়ন্ত বাচ্চার জন্য গড়ে ৫ বর্গফুট জায়গা প্রয়োজন।

গ) ছাগলের ঘর ছন, ঝড়, টিন বা ইটের তৈরি হতে পারে। তবে ঘরের ভিতর বাঁশ বা কাঠের মাচাঁ তৈরি করে তার উপর ছাগল রাখতে হবে।

ঘ) মাঁচার উচ্চতা ১.০ মিটার (৩.৫০ ফুট) এবং মাচাঁ থেকে ছাদের উচ্চতা ১.৮-২.৪ মিটার (৬-৭.৫ ফুট) হবে। গোবর বা চনা পড়ার সুবিধার্থে বাঁশের চটা বা কাঠকে ১ সে:মি: ফাঁকা রাখতে হবে। মাচাঁর নিচ থেকে সহজে গোবর ও চনা সরানোর জন্য ঘরের মেঝে মাঝ বরাবর উঁচুচ করে দুই পার্শ্বে ঢালু (২%) রাখতে হবে।

ঙ) শীতকালে রাতের বেলায় মাঁচার উপর দেয়ালকে চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। শীতের সময় মাঁচার উপর ৪-১১ সে:মি: (৩-৪ ইঞ্চি) পুরু খড়ের বেডিং বিছিয়ে দিতে হবে।

চ) বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন ধরনের ছাগলকে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে রাখা উচিৎ। পাঁঠাকে সব সময় ছাগী থেকে পৃথক করে রাখা দরকার। দুগ্ধবতী, গর্ভবতী এবং শুষ্ক ছাগীকে একসাথে রাখা যেতে পারে। শীতকালে রাতের বেলা বাচ্চাকে মায়ের সাথে ব্রুডিং পেনে রাখতে হবে। ব্রুডিং পেন একটি খাঁচা বিশেষ যা কাঠের বা বাঁশের তৈরী হতে পারে। এর চারপার্শ্বে চটের বস্তা দিয়ে ঢাকা থাকে।

ছ) ছাগলের ঘরের নমুনা: দৈর্ঘ্য ৪০ ফুটপ্রস্থ ২৫ ফুট=১০০০ বর্গফুট; মাচাঁর উচ্চতা ২.৫-৩.৫ ফুট। মাঁচায় বাঁশ বা কাঠের ফালির মাঝখানে ১-১.৫ সে:মি: বা ০.৫০ ইঞ্চি ফাঁকা রাখতে হবে। এরকম একটি ঘরে মোট ১০০-১২৫টি ছাগল রাখা যেতে পারে। মাচাঁর উপর ছাগল উঠার জন্য বর্হিমুখী মেঝে থেকে ৫ ফুট লম্বা সিঁড়ি রাখতে হবে।

খামারের জন্য ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগী নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

- নির্বাচনের সময় ছাগীর বয়স ৯-১২ মাসের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- মাথা লম্বা ও মধ্যম আকারের হবে। মুখ ভরাভরা হবে।কুঁজ ও ঘাড় প্রায় সরল রেখায় বা সোজা থাকবে।
- বুক মধ্যম আকৃতির ও বেশ চওড়া হবে যাতে সামনের দুই পা সামঞ্জস্যপূর্ণ দূরত্বে থাকে।
- পেট তুলনামূলকভাবে বড়, পাঁজরের হাড় চওড়া ও প্রসারণশীল হবে।
- সামনের পা দুটি সোজা, দৃঢ় ও হাড়গুলো মজবুত হবে। পায়ের খুর সমান্তরাল ভাবে মাটিতে পড়বে।
- নির্বাচিত ছাগী অধিক উৎপাদনশীল বংশের হবে। ছাগীর মা, দাদী ও নানীর বছরে ২ বার বাচ্চা দেওয়ার এবং প্রতিবারে একাধিক বাচ্চা দেওয়ার রেকর্ড থাকতে হবে।
- নির্বাচিত ছাগীর মা, দাদী ও নানীর বাচ্চা মৃত্যুর হার ১০% এর নিচে থাকতে হবে।
- নির্বাচিত ছাগীর মা, দাদী ও নানীর দৈনিক গড়ে ৫০০ গ্রাম দুধ প্রদান করার রেকর্ড থাকতে হবে।
- নির্বাচিত ছাগীর ওলান বড়, বাঁট সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিছুটা ভিতরের দিকে বাঁকানো এবং দুধের শিরা লক্ষণ যোগ্য হবে।

খামারের জন্য ব্ল্যাক বেঙ্গল পাঁঠা নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয় সমূহ ঃ

- নির্বাচনের সময় পাঁঠার বয়স ১২-১৪ মাসের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- পাঁঠা হবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং সকল প্রকার যৌন ব্যাধি মুক্ত।
- চামড়া নরম ও ঢিলেঢালা হবে, টানলে উঠানামা করবে।
- পশম মসণৃ ও ছোট ছোট, সিল্কের মত চকচকে হবে।
- মাথা ও ঘাড় পুরুষালি, ভারী হবে। শরীরের পেছনের ভাগ সবল ও দৃঢ় হবে
- অন্ডকোষের আকার বড় ও সুগঠিত এবং দৃষ্টিযোগ্য হবে কিন্তু বেশি ঝুলানো থাকবে না। পাঁজরের হাড়গুলো স্পষ্ট, মজবুত ও দৃঢ় হবে। পেছনের পা দুটি মজবুত, সুঠাম ও শক্তিশালী হতে হবে। জাম্প করায় পটু হতে হবে।
- পাঁঠার মা, দাদী ও নানীর দুধ প্রদানের রেকর্ড কমপক্ষে ৭০০ গ্রাম হবে।
- পাঁঠার মা, দাদী ও নানীর বাচ্চা মৃত্যুর হার কম হবে, বছরে ২ বার বাচ্চা প্রদান এবং প্রতিবারে দুই বা ততোধিক বাচ্চা প্রদানের রেকর্ড থাকতে হবে।

ছাগীকে পাল দেওয়ার উপযুক্ত সময় নির্ধারণ ঃ

- ছাগী গরম হওয়ার ৮ ঘন্টা পর এবং ১৮ ঘন্টার মধ্যে পাল দিতে হয় ।
- প্রয়োজনে এ সময়ের মধ্যে দুইবার পাল দিয়ে গভর্ধারণ নিশ্চিত করা যায় । সকালে গরম হলে বিকালে এবং বিকালে গরম হলে পরের দিন সকালে পাল দেওয়া প্রয়োজন ।
- সঠিক সময়ে পাল দেওয়া না হলে পরবর্তী ১৮ দিন হতে ২১ দিনের মধ্যে ছাগী পুনরায় গরম হবে বা হিটে আসবে ।
- একবার বাচ্চা প্রসবের দেড় হতে দুই মাস পর ছাগী পুনরায় গরম হয় ।
- ছাগীকে ৩-৪ বার পাল দেওয়ার পরও গর্ভবতী না হলে অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ।

প্রজননক্ষম পাঁঠা

প্রজননক্ষম পাঁঠী

খামারে ছাগলের খাদ্য সরবরাহ ঃ
ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমান সুষম দানাদার খাদ্য, পুষ্টিসমৃদ্ধ ঘাস ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে।

ছাগলের দানাদার খাদ্য মিশ্রণ তৈরী ঃ

খাদ্যের উপকরণ	বাচ্চা ছাগলের খাদ্য	বড় ছাগলের খাদ্য
গম/ভূট্টা ভাঙ্গা	২০ ভাগ	৩০ ভাগ
ডাল ভাঙ্গা	২০ ভাগ	১৫ ভাগ
ডালের ভূষি	১০ ভাগ	১০ ভাগ
তিলের খৈল	২৫ ভাগ	২০ ভাগ
ধান ভাঙ্গা	২০ ভাগ	২০ ভাগ
খনিজ মিশ্রণ/ডিসিপি	০৩.৫ ভাগ	০৩.৫ ভাগ
লবণ	০১ ভাগ	০১ ভাগ
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫ ভাগ	০.৫ ভাগ
মোট	১০০ ভাগ	১০০ ভাগ

ছাগলের দৈনিক খাদ্য সরবরাহ ঃ

বয়স (মাস)	ঘাস/পাতা (কেজি)	ইউএমএস (কেজি)	দানাদার খাদ্য (গ্রাম)	ভাতের মাড় (কেজি)
৩-৪	০.৪-০.৫	০.০২-০.০৫	১০০-১৫০	২০০
৫-৬	০.৫-০.৬	০.০৫-০.১০	২০০-২৫০	৩০০
৭-৮	০.৮-১.০	০.১৫-০.২০	২৫০-৩০০	৪০০
৯-১০	১.০-১.২	০.২০	৩০০	৪০০
১১-১২	১.৩-১.৫	০.২৫	৩০০	৪০০
১৩-১৪	১.৫-১.৬	০.২৫	৩০০	৫০০
১৫ বা উপরে	১.৮-২.০	০.২৫	৩০০	৫০০
গর্ভবতী ছাগী	২.০-২.৫	০.২৫	৩৫০	৫০০
দুগ্ধবতী ছাগী	২.০-২.৫	০.২৫	৪০০	৫০০
প্রজননক্ষম পাঁঠা	২.০-২.৫	০.২৫	৪০০-৫০০	৫০০

ছাগলের বাচ্চার জন্য বিকল্প দুধ (মিল্ক রিপ্লেসার) তৈরী ও খাওয়ানো পদ্ধতি ঃ

উপাদানঃ ১) গুড়া দুধ-৭০% ২) চাল/গম/ভুট্টার গুড়া-২০%
৩) সয়াবিন তেল-৭% ৪) লবন-১% ৫) ডিসিপি- ১.৫%
৬) ভিটা-মিনা. প্রিমিক্স-০.৫%

প্রস্তুত প্রনালী ঃ
উক্ত মিশ্রনের ১ ভাগের সাথে ৯ ভাগ বিশুদ্ধ পানি মেশাতে হবে। টিউবওয়েলের পানিকে অন্তত: ৫মিনিট ফুটিয়ে ঠান্ডা করে (কুসুম গরম) বিকল্প দুধ তৈরীতে ব্যবহার করতে হবে। বিকল্প দুধ ফিডারে করে খাওয়াতে হবে। ফিডার, নিপল, দুধের পাত্র পরিষ্কার ও জীবানুমুক্ত রাখতে হবে। বিকল্প দুধ তৈরী করে ১-২ঘন্টার বেশী রাখা উচিত নয়।

বাণিজ্যিক খামারে ছাগলের টিকা প্রদান কর্মসূচী ঃ

টিকার নাম	টিকা প্রয়োগের বয়স	পরবর্তী টিকা প্রয়োগের সময়	টিকা প্রয়োগের স্থান	টিকা প্রয়োগের মাত্রা/পরিমাণ
পিপিআর টিকা	৪ মাস	১ বছর পর	চামড়ার নিচে	১ মি.লি
ক্ষুরারোগ টিকা	৩ মাস	৬মাস পরপর	চামড়ার নিচে	বাই-২মি.লি. ট্রাই-৩মিলি
গোটপক্স টিকা	৪ মাস	৬ মাস পরপর	চামড়ার নিচে	১মিলি
অ্যানথ্রাক্স টিকা	-	১ বৎসর	চামড়ার নিচে	০.৫ মি.লি
গলাফুলা টিকা	৬মাস	১ বৎসর	চামড়ার নিচে	২মিলি
টিটেনাস টিকা (টিটেনাস টক্সয়েড)	প্রসবের পূর্বে ছাগীকে এবং প্রসবের পর বাচ্চাকে	-	মাংশে	১মিলি

বাণিজ্যিক ভেড়া পালন পদ্ধতি ঃ

ভেড়ার খামার স্থাপনে সুবিধা ঃ

- ভোড়ার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অন্যান্য তুলানামূলকভাবে বেশি বিধায় খামারে ক্ষতির সম্ভাবনা কম।
- একটি ভেড়ী বছরে ২ বার বাচ্চা দেয়। প্রতিবার গড়ে ৩টি করে বাচ্চা দেয়। ফলে খামারের আকার দ্রুত বৃদ্ধি পায়।
- ভেড়ার মাংস সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ফলে ভেড়ার মাংসের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। ফলে ভেড়া পালন করে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।
- ভেড়ার চামড়া দিয়ে উৎকৃষ্টমানের দ্রব্য সামগ্রী তৈরী হয় ফলে বাজারে ভেড়ার চামড়ার চাহিদাও বাড়ছে।
- ভেড়ার পশম দিয়ে কম্বল, ম্যাটসহ উন্নতমানের টেক্সটাইল পণ্য উৎপাদন করা হচ্ছে। এতে ভেড়ার পশমের চাহিদাও ক্রমশ: বাড়ছে।
- ভেড়ার খাদ্য খরচ এবং খামার পরিচালনায় লোকবল তুলনামুলকভাবে কম লাগে।
- ভেড়ার বিষ্ঠা দিয়ে উন্নত মানের জৈব সার তৈরী করা যায় ফলে এটিও খামারের জন্য লাভজনক।

বানিজ্যিক খামার স্থাপনে ভেড়ার জাত নির্বাচন ঃ

বাংলাদেশে প্রধানত: অঞ্চলভিত্তিক তিন ধরনের ভেড়া পাওয়া যায়। বরেন্দ্র অঞ্চলের ভেড়া, যমুনা অববাহিকা অঞ্চলের ভেড়া এবং উপকূলীয় এলাকার ভেড়া।বর্তমানে দেশী ভেড়ার পাশাপাশি গাড়ল (নাগপূরী) জাতের ভেড়ার খামারও দেশের বিভিন্ন এলাকায় গড়ে উঠছে। বানিজ্যিক ভেড়ার খামার স্থাপনের জন্য এলাকাভিত্তিক দেশী উন্নত জাত অথবা সংকর জাতের ভেড়া দিয়ে খামার স্থাপন করা যেতে পারে।

ভেড়ার বাসস্থান নির্মাণ ঃ ক) পূর্ব পশ্চিমে লম্বালম্বী, দক্ষিণ দিক খোলা ঘর ভেড়া পালনের জন্য উপযোগী। ভেড়ার খামারের স্থান নির্বাচনে অবশ্যই অপেক্ষাকৃত উঁচু এবং উত্তম পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

খ) প্রতিটি পূর্ণ বয়স্ক ভেড়ার জন্য গড়ে ৮-১০ বর্গ ফুট জায়গা প্রয়োজন। প্রতিটি বাড়ন্ত বাচ্চার জন্য গড়ে ৪-৫ বর্গফুট জায়গা প্রয়োজন।

গ) ভেড়ার ঘর ছন, খড়, টিন বা ইটের তৈরি হতে পারে। তবে ঘরের ভিতর বাঁশ বা কাঠের মাচাঁ তৈরি করে তার উপর ভেড়া রাখতে হবে।

ঘ) মাঁচার উচ্চতা ৩ ফুট এবং মাচাঁ থেকে ছাদের উচ্চতা ৭.৫ ফুট হবে। গোবর বা চনা পড়ার সুবিধার্থে বাঁশের চটা বা কাঠকে ০.৫ ইঞ্চি ফাঁকা রাখতে হবে। মাচাঁর নিচ থেকে সহজে গোবর ও চনা সরানোর জন্য ঘরের মেঝে মাঝ বরাবর উঁচু করে দুই পার্শ্বে ঢালু রাখতে হবে।

ঙ) বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন ধরনের ভেড়াকে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে রাখা উচিৎ। পাঁঠা ভেড়াকে সব সময় ভেড়ী থেকে পৃথক করে রাখা দরকার। শীতকালে রাতের বেলা ভেড়ার বাচ্চাকে মায়ের সাথে ব্রুডিং পেনে রাখতে হবে।

চ) ভেড়ার ঘরের নমুনা: প্রস্থ দৈর্ঘ্য ৪০ ফুট ২৫ ফুট=১০০০ বর্গফুট; এরকম একটি ঘরে মোট ১০০-১২৫টি ভেড়া পালন করা যেতে পারে। মাচাঁর উপর ভেড়ার উঠার জন্য বর্হিমুখী মেঝে থেকে ৫ ফুট লম্বা সিঁড়ি রাখতে হবে।

ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

ভেড়ার দানাদার খাদ্য মিশ্রণ তৈরী ঃ

খাদ্য উপকরণ	বাচ্চা ও বাড়ন্ত ভেড়া (৩-৬মাস)	প্রাপ্ত বয়স্কভেড়া (৬মাসের উর্দ্ধে)
ছোলা ভাঙ্গা	২০ ভাগ	১৫ ভাগ
গম/ভূট্টা ভাঙ্গা	৪০ ভাগ	৫৫ ভাগ
সয়াবিন/তিলের/সরিষার খৈল	৩৫ ভাগ	২৫ ভাগ
খনিজ মিশ্রণ/ডিসিপি	০৩.৫ ভাগ	০৩.৫ ভাগ
লবণ	০১ ভাগ	০১ ভাগ
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫ ভাগ	০.৫ ভাগ
মোট	১০০ ভাগ	১০০ ভাগ

ভেড়ার দৈনিক খাদ্য সরবরাহ ঃ

ভেড়ার বয়স ও ধরন	দৈনিক খাদ্য সরবরাহের পরিমান (গ্রাম)			
	ঘাস লতাপাতা	দানাদার মিশ্রণ	খড় (ইউএমএস)	ভাতের মাড়
বাচ্চা ভেড়া/ভেড়ী (৩-৬মাস পর্যন্ত)	৫০০	১৫০	৫০	৩০০
বাড়ন্ত ভেড়া/ভেড়ী (৬-১২মাস পর্যন্ত)	১৫০০	২৫০	১০০	৪০০
বয়স্ক ভেড়া/ভেড়ী (১২ মাসের উর্দ্ধে)	২৫০০	৩০০	২০০	৫০০
গর্ভবতী ভেড়ী	২০০০	৩৫০	২০০	৫০০
দুগ্ধবতী ভেড়ী	২০০০	৪০০	২০০	৫০০
প্রজননক্ষ পাঁঠা ভেড়া	২৫০০	৪০০	২৫০	৫০০

ভেড়ার বাচ্চার জন্য বিকল্প দুধ (মিল্ক রিপ্লেসার) তৈরী ও খাওয়ানো পদ্ধতি ঃ

উপাদানঃ ১) গুড়া দুধ-৭০% ২) চাল/গম/ভূট্টার গুড়া-২০% ৩) সয়াবিন তেল-৭% ৪) লবন-১% ৫) ডিসিপি- ১.৫% ৬) ভিটা-মিনা. প্রিমিক্স-০.৫%

প্রস্তুত প্রনালী ঃ

উক্ত মিশ্রনের ১ ভাগের সাথে ৯ ভাগ বিশুদ্ধ পানি মেশাতে হবে। টিউবওয়েলের পানিকে অন্তত: ৫ মিনিট ফুটিয়ে ঠান্ডা করে (কুসুম গরম) বিকল্প দুধ তৈরীতে ব্যবহার করতে হবে। বিকল্প দুধ ফিডারে করে খাওয়াতে কবে। ফিডার, নিপল, দুধের পাত্র পরিষ্কার ও জীবানুমুক্ত রাখতে হবে। বিকল্প দুধ তৈরী করে ১-২ঘন্টার বেশী রাখা উচিত নয়।

ভেড়ার মাংসের গুনগতমান ঃ

ভেড়ার মাংস তুলানামূলকভাবে নরম, সুস্বাদু, রসালো এবং বিশেষ কোন গন্ধ নেই। ভেড়ার মাংসে জিংক এবং আয়রনের পরিমান বেশী যা বাচ্চাদের শারীরিক গঠন বৃদ্ধি, টিসু পুর্নগঠন এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। তাছাড়া ভেড়ার মাংসে কারনিটাইন নামক আমিষ ফেটি এসিড থেকে শক্তি উৎপাদনের সাহায্য করে। কপার ম্যংগানিজ এবং সেলেনিয়াম নামক ট্রেস ইলিমেন্ট ভেড়ার মাংসের ভিতর বেশি পরিমানে পাওয়া যায়।

ভেড়া, গরু ও ছাগলের মাংসের গড় পুষ্টি উপাদান

পুষ্টি উপাদান	ভেড়া	গরু	ছাগল
পানি (%)	৭৫	৭৪	৭৪
আমিষ (%)	২৩	২২	২২
চর্বি (%)	২	৩	৩
শক্তি (কিলো : জোল)	৫৪৬	৪৯৮	৪৭৭
ফসফরাস (মি.গ্রাম/১০০ গ্রাম)	২৯০	২১৫	২৬০
ভিটামিন-এ (মি.গ্রাম/১০০ গ্রাম)	১০	২০	১০
ভিটামিন-ই (মি.গ্রাম/১০০)	৫০০	৪০০	৫০০
লোহা (মি.গ্রাম/১০০ গ্রাম)	২	৩	২
ক্যালসিয়াম (মি.গ্রাম/১০০ গ্রাম)	১০	১০	১০
কোলেষ্টেরল (মি.গ্রাম/১০০ গ্রাম)	৭০	৭৬	৭০

ভেড়ার মাংস

গরুর মাংস

ছাগলের মাংসের

ভেড়ার উল বা পশম কাটা বা শেয়ারিং ঃ

শেয়ারিং এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি-সাধারণত দুই ধরনের যন্ত্র দিয়ে ভেড়ার পশম ছাটানো হয়।

ক) হস্ত চালিত ব্লেড শেয়ারার বা কিপার এবং

খ) ইলেকট্রিক্যাল বা বৈদুতিক শেয়ারিং মেশিন।

ভেড়ার পশম কাটার জন্য ৮৫% ক্ষেত্রেই হস্তচালিত ব্লেড শেয়ারার দিয়ে পশম ছাটা হয়। আমাদের দেশে সাধারণত হস্ত চালিত শেয়ারার দিয়ে পশম কাটা হলেও অধিকাংশ উন্নত দেশে পশম ছাটার জনপ্রিয় মেশিন ইলেকট্রিক্যাল শেয়ারারদিয়ে ভেড়া পশম শেয়ারিং করা হয়।

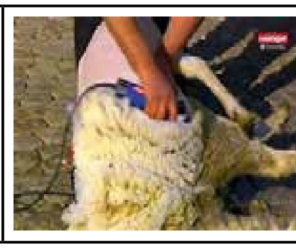

ভেড়ার পশমের ব্যবহার ঃ

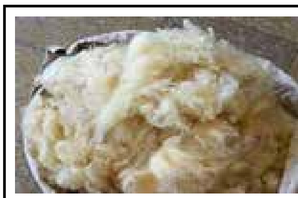

খামারে ভেড়ার টিকা প্রদান সর্মসূচী ঃ

টিকার নাম	টিকা প্রয়োগের বয়স	পরবর্তী টিকা প্রয়োগের সময়	টিকা প্রয়োগের স্থান	টিকা প্রয়োগের মাত্রা/পরিমাণ
পিপিআর টিকা	৪ মাস	১ বছর পর	চামড়ার নিচে	১ মি.লি
ক্ষুরারোগ টিকা	৩ মাস	৬মাস পরপর	চামড়ার নিচে	ট্রাই-৩মিলি
শীপপক্স টিকা	৪ মাস	৬ মাস পরপর	চামড়ার নিচে	১মিলি
অ্যানথ্রাক্স টিকা	-	১ বৎসর	চামড়ার নিচে	০.৫ মি.লি
টিটেনাস টিকা (টিটেনাস টক্সয়েড)	প্রসবের পূর্বে ভেড়ীকে এবং প্রসবের পর বাচ্চাকে	-	মাংশে	১মিলি

সেশন-১৮

সোনালী লেয়ার মুরগী পালন পদ্ধতি

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- ➢ সোনালী মুরগি উৎপাদন প্রক্রিয়া
- ➢ সোনালী মুরগির বাসস্থান নির্মান
- ➢ সোনালী মুরগির বাচ্চা ও লেয়ার পালন পদ্ধতি
- ➢ সোনালী মুরগির খাদ্য সরবরাহ
- ➢ সোনালী মুরগির রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

ক্ষুদ্র ও মাঝারী খামারীদের দারিদ্র বিমোচনে তথা আত্ম-কর্মসংস্থান ও পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশে উদ্ভাবিত সোনালী জাতের মুরগী পালন একটি গুরুত্বপূর্ন পোল্ট্রি শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা দেশের প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণসহ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সোনালী মুরগি বাংলাদেশের একটি সংকর জাতের মুরগি। প্রাণিসম্পদ বিভাগ ১৯৯২-২০০০ সন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় হাঁস-মুরগি খামারে ফাউমী জাতের মুরগীর সাথে আরআইআর জাতের মোরগের সাথে সংকরায়নের মাধ্যমে সিলেকটিভ ব্রিডিং প্রক্রিয়ায় সোনালী মুরগির জাত তৈরী করে। তবে এই সংকর মুরগিকে সোনালী বলা হলেও এসব মোরগ মুরগির ভিতর জিনগত কারনে ৫০% লালচে রঙ্গের মুরগী এবং ৫০% ধুসর রঙ্গের মোরগ তৈরী হতো। পরবর্তীতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা জনাব মোঃ শাহ্জামাল, জয়পুরহাট জেলার- জামালগঞ্জ সরকারী হাঁস-মুরগি খামারে পিএলডিপি'র পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৯৫-২০০০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ গবেষণায় পুন:সংকরায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১০০% রঙ্গীন সোনালী মুরগির জাত উদ্ভাবন করেন যা সারা বাংলাদেশে সোনালী মুরগি নামে পরিচিত।

সোনালী প্যারেন্ট মুরগি উৎপাদন প্রক্রিয়া

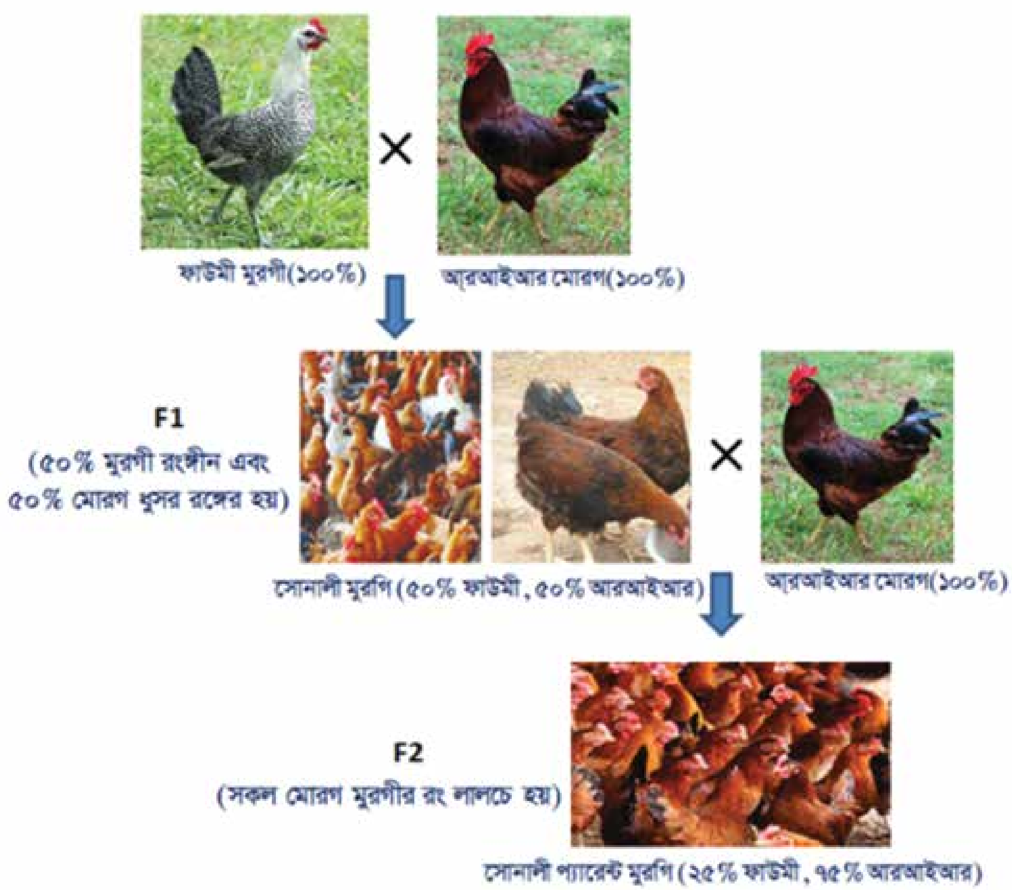

সোনালী মুরগির বাসস্থান ঃ

২০০ টি সোনালী মুরগী পালনের জন্য প্রতিটি মুরগীর জন্য প্রায় ১.৫ বর্গফুট জায়গা ধরে ৩০০ বর্গফুট জায়গাই যথেষ্ট। ঘরের মেঝে থেকে ৩ ফুট জায়গা তার, জালি অথবা বাঁশের জালি দিয়ে আটকিয়ে রাখতে হবে যাতে কুকুর বিড়াল এবং অন্য কোন বন্য প্রাণি খাঁচার নীচে প্রবেশ করতে না পারে।

ঘরের দিকে বাঁশের বা তার জালির বেড়া (ফাঁকগুলি ১ x ১ বর্গ ইঞ্চির) থাকবে যাতে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল করতে পারে। ঘর পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা হবে। ঘরের চালা দোচালা হবে। ঘরের চালা ছন, গোলপাতা, বাঁশের চাটাই দিয়ে তৈরী করা যেতে পারে। টিন ব্যবহার করলে টিনের নীচে অবশ্যই তাপ নিরোধক বা বাঁশের চাটাই দিতে হবে। বড় খামারীরা পাকা স্থায়ী সেড বা ঘর নির্মান করতে পারেন।

খামারের স্থান নির্বাচন ঃ

উঁচু এবং ভাল নিষ্কাষণ ব্যবস্থা, আশপাশ পঁচা ডোবা ও নর্দমা মুক্ত, অন্য খামার থেকে নিরাপদ দুরত্বে বিশুদ্ধ পানি, বিদ্যুৎ যোগাযোগ ও লিটার সরিয়ে ফেলার ভাল ব্যবস্থা আছে এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে। একটি খামার থেকে আর একটি খামারের দুরত্ব হবে কমপক্ষে ৪০০ মিটার।

ঘর পরিস্কার ও জীবানুমুক্তকরণ ঃ

১ম দিন ঝাড়ু ও পানি দিয়ে পরিস্কার, ৩য় ও ৪র্থ দিন সকালে জীবানুনাশক (পভিসেপ, সুপারসেপ্ট, ক্লোরোক্স, আয়োসান, ভিরকন এস) দিয়ে জীবানুমুক্ত করতে হবে এবং সর্বশেষ পরিস্কার পানি দ্বারা ধুঁয়ে ফেলতে হবে। ঘরে মুরগীর বাচ্চা উঠানোর ৩ দিন পূর্বে পুনরায় জীবানুমুক্তকরণ করতে হবে।

সোনালী মুরগী পালন ব্যবস্থাপনা ঃ

বাচ্চার ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা ঃ একদিনের বাচ্চা ঘরে উঠানোর কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা পূর্বে ব্রুডিং এর জন্য সকল প্রকার প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে। শীতকালে সাধারণত ৩-৪ সপ্তাহ এবং গরমকালে ২-৩ সপ্তাহ ব্রুডিং করতে হবে। ইলেকট্রিক বাল্ব, গ্যাসের চুলা, কেরোসিনের চুলা দিয়ে ব্রুডিং করা যায়। সাধারণত ২ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট চিক গার্ড হোভার থেকে ২.০ - ২.৫ ফুট দূরে স্থাপন করা হয়। চিক গার্ডের জন্য হার্ডবোর্ড, বাঁশের চাঁটাই ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

সাধারণত ব্রুডারের ভিতর বাচ্চার অবস্থান তিন ধরনের- ১। সঠিক তাপমাত্রায় বাচ্চা ব্রুডারের ভেতর ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় থাকবে ২। অতিরিক্ত গরম অবস্থায় বাচ্চা ব্রুডারের ভেতর চিক গার্ডের গায়ের দিকে সরে থাকবে ৩। অতিরিক্ত ঠান্ডা অবস্থায় বাচ্চাগুলো হোভারের খুব কাছাকাছি চলে এসে গাদাগাদি করে থাকবে।

বাচ্চার প্রয়োজনীয় ব্রুডিং তাপমাত্রা

সপ্তাহ	তাপমাত্রা (ফাঃ)
১ম	৯৫°
২য়	৯০°
৩য়	৮৫°
৪র্থ	৮০°
৫ম	৭৫°
৬ষ্ঠ	৭০°

বাড়ন্ত বাচ্চা (পুলেট) পালন ঃ

ব্রুডিং শেষে ১৮ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত সময় কালকে বাড়ন্ত অবস্থা বা পুলেট বলা হয়। বাড়ন্ত অবস্থার উপর নির্ভর করে ভবিষ্যত ডিম উৎপাদন। বাড়ন্ত কালীন সময়ে ঝাঁকের সমরূপতা (ঝাঁকের সব মুরগীগুলোর দৈহিক ওজন কাছাকাছি থাকা) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাচ্চার মধ্যে সমরূপতা আনায়নের জন্য অপেক্ষাকৃত দূর্বল বাচ্চার দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। সমরূপতা রক্ষার জন্য খাদ্য গ্রহণের স্থান অর্থাৎ খাদ্য পাত্রের সংখ্যা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

ডিবেকিং ঃ

ঠোকরাঠুকরির প্রবণতা দূর করার জন্য এবং খাদ্যের অপচয় রোধ করার জন্য দুইবার ডিবেকিং করা উচিত। প্রথমে ৬-১৪ দিনের মধ্যে এবং দ্বিতীয় বার ১২-১৬ সপ্তাহ বয়সে। উপরে ঠোঁটের সামনের দিকের অংশ যেটির রং কিছুটা সাদাটে এবং সূচালো হয় (ঠোঁটের ১/৩ ভাগ অংশ) সেটি কেটে বাদ দেয়া হয়। ডিবেকিং মেশিনের সাহায্যে এটি করা হয়।

প্রি-লেয়ার পালন ঃ

সাধারণত ১৮-২০ অথবা ১৮-২২ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত মুরগীকে প্রি লেয়ার বলা হয়। ২০ সপ্তাহ বয়সে ঝাঁকের ওজন লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি থাকলে দিনের আলোর সাথে অতিরিক্ত আলো সরবরাহের মাধ্যমে উদ্দীপনা দেওয়া প্রয়োজন। এ সময়ে ডিম উৎপাদন শতকরা ৫ ভাগ অতিক্রম করলে প্রি-লেয়ার ফিডের পরিবর্তে লেয়ার ফিড সরবরাহ করতে হবে। পুলেট কালীন সময়ের শুরুতে মুরগীর ঘরে ডিম পাড়ার বাক্স বসাতে হবে।

ডিম পাড়া মুরগী পালন ঃ

ডিম পাড়াকালীন সময়ে আলো প্রদানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গড়ে ১৬ ঘন্টা আলোক প্রদান, আদর্শ ডিম উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন। খাদ্য ও পানি সরবরাহ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সরবরাহ করতে হবে। এ সময় মুরগীর ডিম পাড়ার জন্য ডিম পাড়ার বক্স ঘরের মধ্যে স্থাপন করতে হবে।

ডিম পাড়ার বাক্স ঃ

প্রতি ৪-৫টি মুরগীর জন্য ১টি ডিম পাড়ার বাক্স বরাদ্ধ রাখতে হয়। ডিম পাড়ার বাক্সের পরিমাপ ১ x ১ x ১.২০ (দৈঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) ঘনফুট হলেই চলবে। মুরগীর ঘরের অন্ধকার যুক্ত স্থানে যেখানে কম আলো এবং যেখানে মুরগী কম চলাফেরা করে সেই স্থানে মুরগীর ডিম পাড়ার বাসা দিতে হবে। ডিম পাড়ার বাসার সহিত পরিচিতির জন্য অন্ততঃ ২ সপ্তাহ আগে থেকেই ডিম পাড়ার বাসা স্থাপন করতে হবে।

সোনালী মুরগীর খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

গুনগত মান সম্পন্ন খাদ্য ক্রয়, সুষম রেশন তৈরী, খাদ্য উপাদান সমূহ সঠিকভাবে মিশ্রিতকরণ এবং খাদ্য সংরক্ষণ খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রধান অংশ।

বাচ্চার প্রথম খাদ্য ঃ

বাচ্চা খামারে পৌঁছানের পরপরই প্রথম গ্লুকোজ, ওয়াটার সলিউবল ভিটামিন এবং ভিটামিন 'সি' মিশ্রিত পানি (প্রতি লিটার পানিতে গরমের দিনে ৫০ গ্রাম ও শীতের দিনে ২৫-৩০ গ্রাম গ্লুকোজ, ০.৫ গ্রাম ওয়াটার সলিউবল মাল্টিভিটামিন ০.৫ গ্রাম ভিটামিন সি, এবং ০.৫ গ্রাম ইম্যুনো মডিউলেটর মিশিয়ে) চিক গার্ডের পানির পাত্রে সরবরাহ করতে হবে। অতঃপর চিক গার্ডের ভিতরে বাচ্চা ছাড়তে হবে।

প্রয়োজনে বাচ্চা ছাড়ার পূর্বে বাচ্চার ঠোঁট গ্লুকোজ ও ভিটামিন মিশ্রিত পানিতে ডুবিয়ে পানি স্পর্শ করাতে হবে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, বাচ্চা ছাড়ার পর কমপক্ষে ৬ ঘন্টা ভিটামিন মিশ্রিত পানি পান করার পর বাচ্চার পরিপাকতন্ত্র সচল হলে প্রথম দিন গম বা ভুট্টার দানা বা বাচ্চার জন্য তৈরীকৃত খাদ্য যোগান দেয়া যেতে পারে। তারপর লেয়ার ষ্টারটার সরবরাহ করা হয়। প্রথমে প্রতিটি বাচ্চার জন্য ৬-৮ গ্রাম খাবার দরকার হয়।

সোনলী বাচ্চা, পুলেট ও লেয়ার রেশন ও প্রয়োজনীয়পুষ্টি

উপকরণ	পরিমান (কেজি)			
	ষ্টারটার রেশন ০-৮ সপ্তাহ	গ্রোয়ার রেশন (৯-১৬ সপ্তাহ)	পুলেট রেশন (১৭-২২ সপ্তাহ)	লেয়ার রেশন (২৩-অধিক)
গম	৩৫	২২	২৩	১৬
ভুট্টা	১৬.৯	৩০	৩৬	৪০
সয়াবিন	২৭.০	২৮	১৭	১২
চালের কুড়া	১৪.৮	১৫	১৯.৩	১৪.৩
ঝিনুক চূর্ণ	১.৫	১.৫	২.৫	১.৫
ডিসিপি	১.৫	২.৫	১.৫	১.৫
ভিটামিন প্রিমিক্স	০.২৫	০.৫	০.২৫	০.২৫
লাইসিন	০.১৫	০.১২৫	০.১০	০.১০
মিথিওনিন	০.১৫	০.১২৫	০.১০	০.১০
সয়াবিন তেল	২.৫০	-	-	-
ক্যালসিয়াম কার্বনেট	-	-	-	৪.০
খাবার লবন	০.২৫	০.২৫	০.২৫	-
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা				
প্রোটিন	২১.৭৪	২০.৬২	১৬.৭৯	১৭.০০
বিপাকীয় শক্তি (কিলোক্যালোরী/কেজি)	২৯৬০	৩০৩৩	৩১২৫	৩০৪৫
লাইসিন (%)	১.২২	১.১৫	০.৮৫	০.৯৫
মিথিওলিন (%)	০.৪৩	০.৩৯	০.৩৩	০.৩৪
ক্যালসিয়াম (%)	১.৫	১.৫	১.৫	৩.৫
ফসফরাস (%)	০.৮৬	০.৮৯	০.৯০	০.৮০

সোনালী মুরগির খাদ্য সরবরাহ ঃ

সোনালী বাচ্চার খাদ্য সরবরাহ		সোনালী পুলেটের খাদ্য সরবরাহ		সোনালী লেয়ারের খাদ্য সরবরাহ	
বাচ্চার বয়স (দিন)	দৈনিক খাদ্য সরবরাহ (গ্রাম)	পুলেটের বয়স (দিন)	দৈনিক খাদ্য সরবরাহ (গ্রাম)	লেয়ারের বয়স (দিন)	দৈনিক খাদ্য সরবরাহ (গ্রাম)
১	৫	৬০-৭১	৫০-৬০	১২১-১৩৫	৯৫
২	৬	৭২-৭৮	৫৫-৬৫	১৩৬-১৪৯	১০০
৩-৪	৭	৭৯-৮৫	৬০-৬৫	১৫০-১৬৩	১০৫
৫-৮	১০	৮৬-৯২	৬৫-৭০	১৬৪-পরবর্তী	১০৫-১১০
৯-১২	১২	৯৩-৯৯	৭০-৭৫	-	-

১৩-১৫	১৫	১০০-১০৬	৭৫-৮০	-	-
১৬-২১	১৬-১৮	১০৭-১১৪	৮০-৮৫	-	-
২২-২৮	২০-২২	১১৫-১২০	৮৫-৯০	-	-
২৯-৩৫	২৫-২৬	-	-	-	-
৩৬-৪২	৩০-৩২	-	-	-	-
৪৩-৪৯	৩৫-৩৬	-	-	-	-
৫০-৫৬	৪০-৪২	-	-	-	-
৫৭-৬০	৪৫-৫০	-	-	-	-

সোনালী লেয়ার মুরগীর ভ্যাকসিন কর্মসূচী ঃ

বয়স (দিন)	ভ্যাকসিনের নাম	মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি
১দিন	মারেক্স	০.২ সিসি - ঘাড়ের চামড়ার নিচে
৩-৫ দিন	বিসিআরডিভি বা যে কোন লাইভ রানীক্ষেত টিকা	১ ফোঁটা - ১ চোখে
৭-১০ দিন	গামবোরো	১ ফোঁটা - ১ চোখে
১৪-২০ দিন	গামবোরো	১ ফোঁটা - ১ চোখে
২১ দিন	মারেক্স	০.২সিসি - ঘাড়ের চামড়ার নিচে
২৪-২৫ দিন	রানীক্ষেত (লাইভ টিকা)	১ ফোঁটা - ১ চোখে
৩৫ দিন	ফাউল পক্স	পাখার চামড়ার নিচে সুঁচ ফুটানোর মাধ্যমে
৪২ দিন	রানীক্ষেত + ব্রংকাইটিস (লাইভ)	পানিতে (নির্দেশনা মোতাবেক)
৫০ দিন	সালমোনেলা	ঘাড়ের চামড়ার নিচে
৬০ দিন	আরডিভি	রানের মাংসপেশীতে ১ মি.লি.
৮৫-৮৭ দিন	সালমোনেলা	ঘাড়ের চামড়ার নিচে
১২০-১২৫ দিন	রানীক্ষেত+ ব্রংকাইটিস (কিল্ড)	রানের মাংসে

সোনালী প্যারেন্টস মুরগীর হ্যাচিং ডিম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ঃ

বাচ্চা ফুটানোর ডিম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ঃ প্রতিদিনই দুইবার ডিম সংগ্রহ করে ডিমের ট্রেতে রাখতে হবে। যে সমস্ত স্থানে আলো-বাতাস ভালভাবে চলাচল করে সে সমস্ত স্থানে ডিম ৭ দিনের জন্য সংরক্ষণ করা ভাল। হ্যাচিং ডিম সংরক্ষনের জন্য কুল রুম ব্যবহার করা শ্রেয়। কুল রুমের তাপমাত্রা ২০° ডিগ্রি সে.এর নীচে থাকবে।

সোনালী মুরগি খামারের বায়োসিকিউরিটি বা জৈব নিরাপত্তা ঃ

- খামারকে রোগমুক্ত রাখতে এবং কাংখিত উৎপাদন পেতে বায়োসিকিউরিটির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।
- খামারের প্রবেশ পথে জীবানুনাশক পাত্র বা স্পেয়ার রাখতে হবে।
- খামারে ব্যবহারের জন্য পরিচর্যাকারীকে আলাদাভাবে পোষাক ও জুতার ব্যবস্থা করতে হবে।
- মৃত মুরগি গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে বা পুড়ে ফেলতে হবে।
- ঘরে যাতে পাখি, ইঁদুর, কুকুর বা বন্য বিড়াল প্রবেশ করতে না পারে, সে ব্যবস্থা নিতে হবে।
- দর্শণার্থীদের খামার পরিদর্শনে নিরুৎসাহিত করতে হবে।
- খামারের আশপাশ সবসময় পরিষ্কার ও জীবানমুক্ত রাখতে হবে।

সেশন-১৯

বানিজ্যিক টার্কি পালন প্রযুক্তি

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- টার্কিরজাত, বাসস্থান ও খাদ্য সরবরাহ
- টার্কির রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা
- টার্কিরডিম ও মাংসের উপকারিতা

টার্কি পালন ব্যবস্থাপনা ঃ

টার্কির জাত ঃ বিশ্বে টার্কির অনেক জাত রয়েছে তবে আমাদের দেশে পালনের জন্য দুটি জাত বেশি উপযোগী

১. ব্রড ব্রেস্টেড ব্রোঞ্জ টার্কি - এটি ব্রড ব্রেস্টেড ব্রোঞ্জ টার্কির পালকগুলি কালো, তামাটে হয়। মাদি টার্কিও বুকের পালকের রং কালো ও ডগা গুলি সাদা হয।প্রজাতিগুলির ডিম দেওয়া ও উর্বরতা ও ডিম ফোটার পরিমান বেশি নয় এবং ডিমে তা দেয়ার ঝোঁক বেশী হয়।

২. বেল্ট সভিল স্মল হোয়াইট ঃ এটি রং ও আকারে ব্রড ব্রেস্টেড হোয়াইট প্রজাতির খুব কাছাকাছী তবে আয়তনে ছোট। ভারী প্রজাতিগুলির তুলনায় এদের ডিম দেওয়া ও উর্বরতা ও ডিম ফোটার পরিমান বেশি হয় এবং ডিমে তা দেয়ার ঝোঁক কম হয়।

টার্কি পালনের গুরুত্বপূর্ন বিষয় ঃ

❑ পুরুষ ও স্ত্রী টার্কির অনুপাত	১ ঃ ৫
❑ এক দিনের বাচ্চার গড় ওজন	৫০ গ্রাম
❑ যৌন পরিপক্কতার বয়স	৩০ সপ্তাহ
❑ গড় ডিমের সংখ্যা	বছরে ৮০-১০০টি
❑ ডিমে তা দেওয়ার সময়সীমা	২৮ দিন
❑ ২০ সপ্তাহে গড় ওজন	স্ত্রী ৪.৫- ৫.০ কেজি, পুরুষ ৭-৮ কেজি
❑ ডিম দেওয়ার সময়সীমা	২২-২৪ সপ্তাহ
❑ বাজারজাত করার উপযুক্ত বয়স	স্ত্রী-১৭-১৮ সপ্তাহ, পুরুষ-১৪-১৫ সপ্তাহ
❑ বাজারজাত করার উপযুক্ত ওজন	স্ত্রী–৫. ৫ কেজি, পুরুষ-৭.৫কেজি
❑ খাদ্য কার্যকারিতা	১ঃ ২.৮
❑ বাজারজাত করা পর্যন্ত খাদ্য গ্রহণ	পুরুষ-২৪-২৬ কেজি, স্ত্রী -১৭-১৯ কেজি

টার্কি ডিম ফুটানো ঃ (ক) প্রাকৃতিক উপায়ে-তা দেওয়া স্ত্রী পাখির সাহায্যে স্বাভাবিক উপায়ে ডিম ফুটানো যায়। টার্কি সাধারণত ভালোভাবেই তা দেয় এবং তা দিতে বসা মাদি ১০-১৫ টি ডিম ফোটাতে পারে। ফুটানোর জন্য পরিস্কার খোসা ও ভালো আকারের ডিম তা দেওয়ার জন্য পাখির নিচে বসাতে হবে।

খ) কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফোটানো ঃ কৃত্রিম উপায়ে ইনকিউবিটরের সাহায্যে ডিম ফুটানো হয়।

ব্রুডিং ঃ ০-৪ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত সময়কে টার্কির ব্রুডিং পিরিয়ড বলে। তবে শীতকালে ব্রুডিং পিরিয়ড বাড়িয়ে ৫-৬ সপ্তাহ করা হয়। সাধারণত মুরগির তুলনায় টার্কির দ্বিগুন হোভারের জায়গা প্রয়োজন হয়। একদিন বয়সের শাবকদের ব্রুডিং-এর জন্য অবলোহিত আলোর বাল্ব বা গ্যাস ব্রুডার ও চিরাচরিত ব্রুডিং ব্যবস্থা ব্যবহার করা যায়।

টার্কি বাচ্চা স্বভাবতঃই জন্মের পরে প্রথম কয়েকদিন খারাপ দৃষ্টিশক্তি ও ভয় পাওয়ার কারণে কিছু খেতে বা পান করতে চায় না । এ জন্য একটু কৌশলে খাওয়াতে হয়।

জোর করে খাওয়ানো ঃ

বাচ্চাদের অল্প দিনের মধ্যে মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ অভুক্ত থাকা। তাই খাদ্য ও পানি সরবরাহের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হবে। জোর করে খাওয়ানর ক্ষেত্রে প্রতি লিটার পানিতে ১০০ মিলি হারে দুধ মিশিয়ে খাওয়াতে হবে এবং পনের দিন পর্যন্ত প্রতি ১০ টি বাচ্চার জন্য একটি ডিম সিদ্ধ দিতে হবে। এটি বাচ্চাদের প্রোটিন ও এনার্জির প্রয়োজন মেটাবে।

খাবারের পাত্রটিকে আলতো করে আঙুল দিয়ে ঠুকে বাচ্চাদের খাবারের দিকে আকৃষ্ট করা যেতে পারে। ফিডার এবং ওয়াটারারে রঙিন মার্বেল বা নুড়িপাথর রাখলেও শাবকেরা সেদিকে আকর্ষিত হবে। যেহেতু টার্কিরা সবুজ শাক পাতা ভালবাসে, তাই খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কিছু কুচানো সবুজ পাতাও খাবারে মেশাতে হবে। এই সঙ্গে প্রথম ২ দিন রঙীন ডিমের পাত্র-কও ফিডার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

লিটারের সরঞ্জাম ঃ

ব্রিডিং-এর জন্য সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত লিটারের সরঞ্জামগুলি হল কাঠের চোকলা, কাঠের গুঁড়ো, ধানের তুষ, টুকরো খড় ইত্যাদি। প্রথমে ২ ইঞ্চি পুরু করে মেঝেতে লিটার বিছাতে হবে এবং আস্তে আস্তে তা বাড়িয়ে ৩-৪ ইঞ্চি পর্যন্ত করা যেতে পারে। দলা বেঁধে যাওয়া আটকাতে লিটার কিছুদিন পরে পরেই উলটে পালটে দিতে হবে।

পালন পদ্ধতিঃ

টার্কি মুক্ত ভাবে চরে বেড়ানো অথবা নিবিড় পদ্ধতিতে পালন করা চলে।

(ক) মুক্ত চারণ পালন পদ্ধতি ঃ

মুক্ত চারণ পদ্ধতিতে, এক একর ঘেরা জমিতে ২০০-২৫০টি পূর্ণ বয়স্ক টার্কি পালন করা যায়। রাতে পাখী প্রতি ৩-৪ ব.ফুট হারে আশ্রয়ের জন্য জায়গার ব্যবস্থা রাখতে হবে। চরে খাওয়ার সময় তাদের শিকারী জীব-জন্তুর হাত থেকে বাঁচাতে হবে। ছায়া ও শীতল পরিবেশের জন্য গাছ লাগান বাঞ্চনীয়। চারণভূমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করতে হবে যার ফলে পরজীবী সংক্রমণের ঘটনা কম হতে সাহায্য করবে।

মুক্ত চারণ ব্যবস্থায় খাওয়ানো ঃ টার্কি খুব ভালোভাবে অবর্জনা খুঁটে খায় বলে এরা কেঁচো, ছোট পোকা-মাকড়, শামুক, রান্না ঘরের বর্জ্য ও উই পোকা খেতে পারে যাতে প্রচুর পোটিন আছে ও খাবারের খরচকে পঞ্চাশ শতাংশে কমিয়ে দেয়। এ ছাড়া সিম জাতীয় পশুখাদ্য যেমন লুসার্ন, ডেসম্যান্থস,স্টাইলো ইত্যাদি খাওয়ানো যায়। চড়ে বেড়ানো পাখির পায়ের দুর্বলতা ও খোঁড়া হওয়া আটকাতে খাবারে ঝিনুকের গুড়া/ডিসিপি মিশিয়ে সপ্তাহে ২৫০ গ্রাম হিসেবে ক্যালসিয়াম দিতে হবে। খাবারের খরচ কম করার জন্য শাক-সব্জির বর্জ্য অংশ দিয়ে খাবারের দশ শতাংশ পরিমান পূরণ করা যেতে পারে।

(খ) নিবিড় পালন পদ্ধতি ঃ

উপকারিতা-

- উন্নত উৎপাদন দক্ষতা
- উন্নত পরিচালন ও রোগ-ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ।

বাসস্থান ঃ

- রোদ-বৃষ্টি,ঝড়, শিকারী জীবজন্তু হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভালো বাসস্থান জরুরি।
- ঘর পূর্ব-পশ্চিম লম্বা করে তৈরি করতে হবে।
- দুটি ঘরের মধ্যে অন্ততঃ ২০ মিটার দূরত্ব রাখতে হবে।
- বিভিন্ন বয়সের পাখির ঘরের মধ্যে দূরত্ব হবে ৫০-১০০ মিটার ।

- খোলা ঘরের প্রস্থ ৯ মিটারের বেশি হওয়া চলবে না।
- মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত উচ্চতা হবে ২.৬-৩.৩ মিটার।
- বৃষ্টির ছাট আটকাতে ঘরের চালা এক মিটার বাড়িয়ে দিতে হবে।
- ঘরের মেঝে সস্তা, টেকসই ও নিরাপদ ও আর্দ্রতা রোধক বস্তু যেমন কংক্রিট দিয়ে তৈরি করা ভালো।

ডিপ লিটার পদ্ধতিতে টার্কি পালনের সাধারণ পরিচালনা ব্যবস্থা মুরগি পালনেরই অনুরুপ, তবে বড় আকারের পাখির জন্য যথাযথ বসবাস, পানি ও খাদ্যের পাত্রের জায়গার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

টার্কি ধরা ও নাড়াচাড়া করা ঃ সব বয়সের পাখিকে খুব সহজেই লাঠি দিয়ে এক জায়গ থেকে অন্য জায়গায় তাড়িয়ে নেয় যায়। টার্কি ধরার জন্য সব সময়ই অন্ধকার ঘর ভালো। এ অবস্থায় সহজেই চোট না লাগিয়ে দু'পা ধরে তোলা যায়। তবে বয়স্ক টার্কিকে ৪ মিনিটের বেশি সময় ঝুলিয়ে রাখা উচিৎ নয়।

টার্কির বাসস্থান, ফিডার এবং ওয়াটারের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ ঃ

বয়স	বাসস্থানের আয়তন (বর্গফুট)	ফিডারের আয়তন (সে.মি.) লিনিয়ার ফিডার	ওয়াটারের আয়তন (সে.মি.) লিনিয়ার ফিডার
০-৪ সপ্তাহ	১.২৫	২.৫	১.৫
৫-১৬ সপ্তাহ	২.৫	৫.০	২.৫
১৬-২৯ সপ্তাহ	৪.০	৬.৫	২.৫
টার্কি ব্রিডার	৫.০	৭.৫	২.৫

ডিবিকিং (ঠোঁঠ কাটা) ঃ পালক ঠোকরানো এবং অন্য পাখিকে ঠোকরানো প্রতিরোধ করার জন্য ডিবিকিং করতে হয়। একদিন বা ৩-৫ সপ্তাহ বয়সে ডিবিকিং করা হয়। নাকের ছিদ্র থেকে ঠোঁটের ডগার প্রায় অর্ধেক দূরত্বে ঠোঁট কাটতে হয়।

ডিস্নুডিং ঃ ঠোকরানো ও মারামারি থেকে মাথায় আঘাত লাগা আটকাতে স্নুড বা ঠোঁটের গোড়ার মাংস সরিয়ে ফেলা হয়। একদিন বয়সে আঙ্গুলের চাপ দিয়ে স্নুড তুলে ফেলা হয়। ৩ সপ্তাহ বয়সে তা ধারাল কাঁচি দিয়ে মাথার একবারে কাছাকাছি কেটে ফেলা হয়।

ডিটোয়িং ঃ একদিন বয়সে ক্লিপিং করা হয়। এ জন্য বাইরের দিকে টো প্যাডের ভেতর ঘেঁসে আঙ্গুলের ডগা ও পুরো নখটি কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়।

খাবার দেওয়ার পদ্ধতি ঃ ম্যাশ খাওয়ানো ও পিলেট খাওয়ানো-

- মুরগির তুলনায় টার্কির শক্তি, প্রোটিন ও খনিজের প্রয়োজন বেশি।
- যেহেতু পুরুষ ও স্ত্রীর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শক্তির পরিমান আলাদা, তাই ভালো ফল পাওয়ার জন্য তাদের পৃথকভাবে পালন করতে হয়।
- খাবার ফিডারে দিতে হবে।
- যখনই এক রকম খাবার থেকে অন্য রকম খাবারে পরিবর্তন করা হবে তা যেন আস্তে আস্তে করা হয়।
- সব সময় পরিস্কার পানি দিতে হবে।
- গ্রীস্মকালে বেশি সংখ্যক পানির পাত্র দিতে হবে এবং অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা সময়ে খাবার দিতে হবে।
- পায়ের দুর্বলতা এড়াতে খাবারের সাথে ঝিনুকের গুড়া দিতে হবে।

সবুজ খাদ্য ঃ নিবিড় পদ্ধতিতে ড্রাইম্যাশ হিসেবে মোট খাদ্যের ৫০% পর্যন্ত সবুজ খাবার দিতে হবে। সব সময় টার্কির জন্য টাটকা লুসার্ন, হাইড্রোপনিক ভূট্টা ঘাস, নরম কলমি ও হেলেঞ্চা কুচি করে টার্কিকে খাওয়ানো যেতে পারে।

টার্কির একটি আদর্শ খাদ্য তালিকা ঃ

ক্রমিক	উপাদান	পরিমান (%)
১	ধান/গম(১ঃ১)	৪০
২	ভুট্টা	২৫
৩	সয়াবিন মিল	১০
৪	ঘাসের বীজ	৭
৫	সূর্যমুখী বীজ	১০
৬	ঝিনুক গুড়া	৬.৫
৭	লবন	১
৮	ভিটামিন প্রিমিক্স	০.৫

টার্কির বয়স অনুযায়ী ওজন ও খাদ্য গ্রহণ ঃ

বয়স সপ্তাহে	গড় ওজন (কিলো)		মোট খাদ্য গ্রহণ (কিলো)	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
৪ সপ্তাহ পর্যন্ত	০.৭২	০.৬৩	০.৯৫	০.৮১
৮ম সপ্তাহ পর্যন্ত	২.৩৬	১.৯০	৩.৯৯	৩.৪৯
১২ সপ্তাহ পর্যন্ত	৪.৭২	৩.৮৫	১১.৩৪	৯.২৫
১৬ সপ্তাহ পর্যন্ত	৭.২৬	৫.৫৩	১৯.৮৬	১৫.৬৯
২০তম সপ্তাহ পর্যন্ত	৯.৬২	৬.৭৫	২৮.২৬	২৩.১৩

প্রজনন ঃ স্বাভাবিক প্রজননে পুরুষ ও মাদীর অনুপাত মাঝারী ধরণের টার্কির জন্য ১ ঃ ৫, বড় ধরণের জন্য ১ ঃ ৩ থাকে। প্রতিটি পূর্ণ বয়স্ক মাদী পাখি থেকে গড়ে ৪০-৫০ টি ছানা পাওয়ার আশা করা যায়। উর্বরতা কমে যাওয়ার দরুন প্রথম বছরের পর পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ পাখি সঙ্গমের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ পাখির কোনও একটি বিশেষ মাদীর প্রতি আকর্ষন জন্মানোর প্রবণতা থাকে, তাই প্রতি ১৫ দিন অন্তর পূর্ণবয়স্ক পুরুষ পাখি বদলাতে হবে।

টার্কির কৃত্রিম প্রজনন ঃ

বীর্য সংগ্রহ করা ঃ টার্কির বীর্য সংগ্রহ করার জন্য পুরুষ পাখির বয়স ৩২-৩৬ সপ্তাহ হতে হবে। বীর্য সংগ্রহের অন্ততঃ ১৫ দিন আগে থেকে পুরুষ পাখিটিকে একলা রাখতে হবে। পুরুষ পাখিটিকে নিয়মিতভাবে হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে এবং বীর্য সংগ্রহ করার জন্য সময় লাগবে ২ মিনিট। পুরুষ পাখি স্পর্শকাতর হয় বলে সর্বেচ্চ পরিমান বীর্য পাবার জন্য একই পালনকারীকে বীর্য সংগ্রহের কাজে লাগানো উচিৎ। গড়ে বীর্যের পরিমান ০.১৫-০.৩০ মিলি হয়ে থাকে। সংগ্রহ করার এক ঘন্টার মধ্যে বীর্য ব্যবহার করতে হবে। সপ্তাহে তিন দিন বা একদিন অন্তর বীজ সংগ্রহের কাজ করা উচিৎ।

পুরুষ টার্কির সিমেন সংগ্রহ

মাদী পাখীকে নিষিক্ত করা ঃ পাখির পাল ৮-১০ % ডিম উৎপাদনে পৌঁছালে কৃত্রিম প্রজনন করা হয়। প্রতি তিন সপ্তাহে ০.২৫-০.৩০ মিলি পাতলা না করা বীর্য দিয়ে মাদী পাখিদের নিষিক্ত করা যায়। প্রজনন ঋতুর ১২ সপ্তাহ পর থেকে প্রতি পনের দিন অন্তর নিষিক্ত করা ভালো। ১৬ সপ্তাহ ব্যাপী প্রজনন ঋতুতে গড় উর্বরতা ৮০-৮৫ % হওয়া উচিৎ।

স্ত্রী টার্কির কৃত্রিম প্রজনন

টার্কির সাধারণ রোগ, কারন, লক্ষণ ও প্রতিরোধ ঃ

রোগ	কারণ	লক্ষণ	প্রতিরোধ
অ্যারিজোনোসিস	সালমোনেলা অ্যারিজোনা	ছানা বাড়ে না এবং চোখে অস্বচ্ছতা ও অন্ধত্ব দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত হবার সম্ভাব্য বয়স ৩-৪ সপ্তাহ।	সংক্রমিত ব্রীডারের পালকে বর্জন করা ও হ্যাচারী ফিউমিগেশন করা।
সিআরডি	মাইকোপ্লাজমা গেলিসেপ্টিকাম	কাশি,ঘর ঘর শব্দ, নাক দিয়ে সর্দি ঝরবে।	মাইকোপ্লাজমা বিহীন বাচ্চা সংগ্রহ করতে হবে।
ফাউল কলেরা	পাসচুরেলা মালটোসিডা	সবুজ, হলুদ পায়খানা	টিকা প্রদান
ফাউল পক্স	পক্স ভাইরাস	ঝুঁটি ও ওয়াটলে ফোসকা	টিকা প্রদান
রানীক্ষেত	প্যারামিক্সভাইরাস	সাদা পায়খানা, হা করে শ্বাস নেয়া	টিকা প্রদান
টার্কি করাইজা	বরডেটেল্লা এভিয়াম	নাকে চাপ শব্দ, ফুসফুসে ঘর ঘর শব্দ	টিকা প্রদান
কক্সিডিওসিস	আইমেরিয়া প্রটোজোয়া	রক্তযুক্ত ডায়রিয়া	যথাযথ জীবাণুনাশক ও লিটার ঠিক রাখা।

টার্কির টিকা প্রদান কর্মসূচি ঃ

বয়স	টিকার নাম
১ দিন	মারেক্স
৪-৫ দিন	রানীক্ষেত
৪র্থ সপ্তাহ	রানীক্ষেত
৫ম সপ্তাহ	ফাউল পক্স
৬ম সপ্তাহ	ফাউল কলেরা
৭ম সপ্তাহ	রানীক্ষেত
৮ম-৯ম সপ্তাহ	এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা (RE-6)
১৪ সপ্তাহ	ফাউল কলেরা

টার্কি বাজারজাত করা ঃ পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ টার্কির ১৬ সপ্তাহে শরীরের ওজন হয় ৭.২৬ কেজি. এবং মাদী টার্কির ওজন হয় ৫.৫৩ কেজি। টার্কি বাজারজাত করার জন্য এটি উপযুক্ত সময়।

টার্কির ডিম ঃ একটি টার্কি ৩০ সপ্তাহ বয়স থেকে ডিম পাড়া শুরু করে। ডিম পাড়া আরম্ভ থেকে শুরু করে ২৪ সপ্তাহ পর্যন্ত ডিম দেয়। সঠিক খাদ্য ও যথাযথ কৃত্রিম আলো প্রয়োগ করলে মাদী টার্কি বছরে ৬০-১০০টি পর্যন্ত ডিম দিতে পারে । মোট ডিমের ৭০% বিকালে পাড়ে। টার্কির ডিম রঙিন হয়। ডিমের ওজন প্রায় ৮৫ গ্রাম হয়। ডিম একদিকে লক্ষণীয়ভাবে ছুঁচোল হয় ও খোসা শক্ত হয়। টার্কি ডিমে প্রোটিন, লিপিড, কার্বোহাইড্রেট ও খনিজ থাকে যথাক্রমে-১৩.১%, ১১.৮%, ১.৭%,এবং ০.৮%। কোলেস্টরেল থাকে ১৫.৬৭-২৩.৯৭ মি.গ্রাম/গ্রাম কুসুম। টার্কির ডিম সুস্বাদু ও পুষ্টিকর।

টার্কির ডিম

টার্কির মাংস ঃ টার্কির মাংসে সব থেকে কম চর্বি থাকায় মানুষ এটি বেশি পছন্দ করে। প্রতি ১০০ গ্রাম টার্কির মাংসে প্রোটিন-২৪%, ফ্যাট-৬.৬% ও এনার্জির-১৬২ ক্যালরি পরিমান থাকে। এতে খনিজ পদার্থ যেমন- পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, আয়রন, সেলেনিয়াম, জিংকবেশী পরিমানে থাকে। এটি অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো এসিড এবং ভিটামিন (নিয়াসিন, ভিটামিন বি-৬ ও বি ১২)সমৃদ্ধ। এটি অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড ও অত্যাবশ্যক ফ্যাটি এসিড সমৃদ্ধ এবং এতে কোলেস্টেরলের পরিমাণ কম।

টার্কির মাংস

সেশন-২০

জুনোটিক রোগের পরিচিতি, কারন ও প্রতিরোধ

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- ➢ জুনোটিক রোগ সম্পর্কে ধারণা
- ➢ জুনোটিক রোগের ঝুঁকি ও বিস্তার
- ➢ জুনোটিক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা
- ➢ কমিউনিটি এনিমেল হেলথ ব্যবস্থাপনা

জুনোটিক রোগের ঝুঁকি এবং ব্যবস্থাপনা ঃ

জুনোটিক রোগ ঃ

- মানুষ থেকে পশুপাখিতে এবং পশু-পাখি থেকে মানুষে যে সব রোগ সংক্রমিত হয় তাদেরকে জুনোটিক রোগ বলে। মানুষে বিদ্যমান রোগ সংক্রমনের ৬০% হচ্ছে জুনোটিক ।

জুনোটিক রোগ দুই ধরনের হতে পারে- ক) উদীয়মান (Emerging) খ) পুনরুত্থিত (Re-emerging)

- মানুষে উদীয়মান রোগ সমূহের ৭৫% হচ্ছে পশুপাখি হতে প্রাপ্ত ।
- মানুষে প্রতি বছর গড়ে ৫টি করে নতুন রোগ দেখা দেয় যার মধ্যে ৩টি হচ্ছে পশুপাখি হতে প্রাপ্ত ।

জুনোটিক রোগের সংক্রমন ঃ

- বায়ুর মাধ্যমে ভাইরাসের সংক্রমন- বায়ুবাহিত
- আক্রান্ত মাংস অথবা দুধ ভক্ষনের মাধ্যমে- খাদ্য বাহিত
- প্রাণিদের ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আসার মাধ্যমে (মলমূত্র, পশুর রক্ত, লালারস ইত্যাদি মাধ্যমে)
- প্রাণিদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসলে (আক্রান্ত পশুর কামড়ের মাধ্যমে)

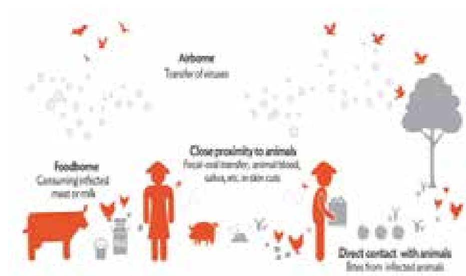

কারা জুনোসিসের ঝুঁকিতে ?

- পশু-পাখি এবং কীটপতঙ্গের প্রত্যক্ষ/ঘনিষ্ট স্পর্শে বসবাসকারী ব্যক্তিবর্গ (যেমন, কৃষক তত্ত্বাবধায়ক, পশুরমালিক)
- পশু-পাখি প্রাকটিশনার (যেমন, পশু চিকিৎসক, সকল টেকনিশিয়ান, টিকাপ্রদানকারী)
- কাঁচা প্রাণিজাত পণ্য (মাংস, চামড়া, দুধ ইত্যাদি) তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ যেমন- কসাই, মুচি, গোয়ালা, গৃহকত্রী

জুনোসিসের প্রভাব ঃ

- মানুষ ও পশুপাখির স্বাস্থ্যর উপর প্রভাব (মৃত্যু এবং অক্ষমতা)
- পশুসম্পদের মৃত্যু এবং উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া
- জুনোটিক ব্যধি নিয়ন্ত্রন প্রোগ্রামটি ব্যয়বহুল
- ব্যবসা-বানিজ্যের উপর প্রভাব
- মানসিক আঘাত জনিত কারনে (পোষা প্রাণি হারানো, মূল্যবান অর্থনৈতিক প্রাণি হারানো) পরোক্ষ ভাবে মানুষের মনের উপর প্রভাব ফেলে।

বাংলাদেশের প্রচলিত জুনোসিস রোগঃ

● র‍্যাবিস ● ব্রুসেলোসিস ● জাপানিজ এনসেফালাইটিস ● বোভাইন টিউবারকুলোসিস ● এ্যনথ্রাক্স ● ইয়েলোফিভার ● এভিয়ান ইনফ্লেয়েঞ্জা ● বোভাইন স্পঞ্জিফর্ম এনসেফালাইটিস ● নিপাহ্ ভাইরাস ● হাইডাটিডোসিস ● টক্সোপ্লাজমোসিস ইত্যাদি।

জুনোটিক ব্যাধির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ঃ

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এমন একটি প্রক্রিয়া যা দ্বারা নির্ধারন, পুনঃনিরীক্ষন, নির্বাচন ও বাস্তবায়নকে বোঝায় যা মানুষ, পশু-পাখি এবং পরিবেশের স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমায়।

মূল পদক্ষেপ গুলো -

- নিয়মিত নজরদারি এবং প্রতিবেদন
- উপযুক্ত জীব নিরাপত্তা পরিমাপের মাধ্যমে প্রাণির উৎস প্রতিরোধকরন
- নিয়ন্ত্রন কৌশল এবং ক্ষতিপূরন

নিয়মিত নজরদারি এবং প্রতিবেদন ঃ

১. শুরুতেই রোগ সনাক্তকরন
২. দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহন
৩. উপযুক্ত সতর্কীকরন পদ্ধতি
৪. সব ভেটেরিনারিয়ান, পশুর মালিক এবং ভালো মানের ভেটেরিনারি এবং প্রশাসনিক সেবা সমূহের মধ্যে উচ্চ মানের সচেতনতা বৃদ্ধিকরন

প্রাণির উৎস প্রতিরোধে গৃহিত ব্যবস্থা ঃ

- কঠোর জীব নিরাপত্তা
- আক্রান্ত পশুকে আলাদাকরন (পৃথকীকরন)
- নতুন পশুপাখি অথবা যানবাহন প্রবেশে বাধা প্রদান
- যে কোনপাখির অসুস্থতা এবং মৃত্যু রিপোর্টকরন
- আক্রান্ত স্থান ভালোভাবে পরিষ্কারকরন, জীবানমুক্তকরন এবং মৃত প্রাণি বা ব্যবহৃত দ্রব্যাদি মাটিতে পুঁতে ফেলা
- টিকাপ্রদান/চিকিৎসা

নিয়ন্ত্রন কৌশল এবং ক্ষতিপূরন ঃ

- মানব কর্তৃক ধ্বংস
- ভালোভাবে মাটিতে পুঁতে ফেলা
- কঠোর ভাবে আলাদাকরন
- উপযুক্ত স্থানে ক্ষতিপূরণ প্রদান
- ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক পোশাক গ্লাভস, বুট,মাস্ক, গগলসও অন্যান্য সরঞ্জামাদি
- নিজের ও ব্যধির মধ্যে বাধা সৃষ্টিকরন বিশেষত হাত কেটে গেলে, ছিলে গেলে এবং ফেটে গেলে।

পরিষ্কারকরন এবং জীবানুমুক্তকরন ঃ

- গোবর, বিষ্ঠা সঠিকভাবে হ্যান্ডেলিং এর মাধ্যমে সরিয়ে ফেলতে হবে।
- খাবার পানি এবং যন্ত্রপাতি দূষিত না হওয়া
- পরিষ্কার জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- নিজস্ব প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি পরিষ্কার এবং জীবানুমুক্ত করন
- ব্যক্তিগত সরঞ্জামাদি খুলে ফেলার পর হাত ভালোভাবে ধুয়ে ফেল।

বায়ুজনিত সংক্রমনহ্রাস করা ঃ

- পর্যাপ্ত আলোবাতাস চলাচল
- ধুলাবালি নিয়ন্ত্রন
- নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মাস্ক পরিধান করা
- আক্রান্ত পশু এবং তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হ্যান্ডেলিংয়ের সময়
- বাচ্চা প্রসবে সাহায্যের সময়
- ধৌত করনের সময়

ভেক্টর নিয়ন্ত্রন ঃ

- বাসস্থানহ্রাসকরা/ নির্মূল করা
- পরজীবী অথবা রোগ জীবানুবাহী কীটপতঙ্গ
- পরিনত ভেক্টর নিয়ন্ত্রন
- কীটনাশক স্প্রে করা
- টোপ ফেলা এবং উড়ন্ত ফাঁদ ব্যবহার করা

সেশন-২১

অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (AMR) ও তার প্রতিরোধ

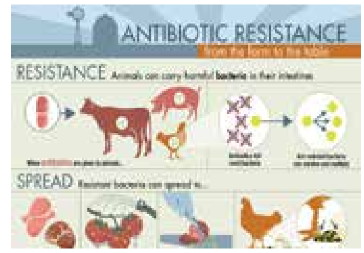

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- ➢ অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স সম্পর্কে ধারনা
- ➢ অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্ট হওয়ার কারন
- ➢ অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স প্রতিরোধে করণীয়

Anti Microbial Resistance (AMR) ঃ

- AMR হল অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ড্রাগসগুলোর (যেমন- অ্যান্টিভাইরালস এবং অ্যান্টিম্যালারিয়ালস) বিভিন্ন অণুজীব (যেমন- ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এবং কিছু পরজীবী) এর বিরুদ্ধে কর্মক্ষমতা হ্রাস পাওয়া।
- দীর্ঘদিন একজাতীয় ঔষধ ব্যবহারের ফলে টিকে থাকার তাগিতে অনুজীবগুলো নিজেদের মধ্যে জেনেটিক মিউটেশন ঘটায় এবং গঠনগতভাবে পরিবর্তন ঘটিয়ে ঔষধকে অকার্যকর করে ফেলে।
- অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ড্রাগসগুলোর বিরুদ্ধে জেনেটিক মিউটেশন ঘটিয়ে টিকে থাকার ক্ষমতা অর্জন করা সেই সকল অনুজীবগুলোকে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স বলা হয়।

কিভাবে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (AMR) হয় ?

- সাধারণত শরীরে খুব অল্প কিছু রেজিস্ট্যান্ট ব্যাক্টেরিয়া থাকতে পারে।
- অ্যান্টিবায়োটিক সকল ব্যাক্টেরিয়া কে মেরে ফেললেও, রেজিস্ট্যান্ট ব্যাক্টেরিয়াকে মারতে পারে না।
- তখন রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া বংশবৃদ্ধি শুরু করে।
- রেজিস্ট্যান্ট ব্যাক্টেরিয়া রেজিস্ট্যান্ট ক্ষমতা অন্য ব্যাক্টরিয়া তে সরবারহ করে।
- অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স হলো এমন একটি অবস্থা, যখন কতিপয় অনুজীব অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ড্রাগসগুলোর আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকার ক্ষমতা অর্জন করে। এসব অনুজীবকে বলা হয় অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ড্রাগস রেজিস্ট্যান্ট অনুজীব।
- এরা অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ড্রাগসগুলোর উপস্থিতিতে অভিযোজিত হয়ে যায় বলে নিজেদের স্বাভাবিক গতিতে বেড়ে উঠতে ও বংশবিস্তার করতে পারে।
- ফলে মানুষ বা পশুর শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়। আগে যে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ড্রাগসগুলোর মাধ্যমে তাদের রোগ সেরে যেত এখন আর সেই অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ড্রাগসগুলোর মাধ্যমে তা সরে না বরং ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।
- এসব রোগক্রান্ত মানুষ বা পশু অন্য কারো উপস্থিতিতে হাঁচি-কাশি প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের শরীরের অভ্যন্তরীণ অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ড্রাগস রেজিস্ট্যান্স অনুজীব অন্যদের মাঝেও ছড়িয়ে দেয় এবং তারাও একই রকম দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়।

AMR কেন হয় ?

- অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল গুলির অপব্যবহার এবং অতিরিক্ত ব্যবহার এই প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করছে।
- অ্যান্টিবায়োটিকগুলি মানুষ এবং প্রাণিদের অতিরিক্ত ব্যবহার এবং অপব্যবহার করা হয় এবং প্রায়শই পেশাদার তদারকি ছাড়াই দেওয়া হয়।
- রোগের চেয়ে চিকিৎসক বেশি।
- পেসক্রিপশন বিহীন অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ড্রাগস বিক্রি।
- যখন বিভিন্ন জীবাণু (বিভিন্ন অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ঔষধগুলি যেমন অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিফাঙ্গালস, অ্যান্টিভাইরালস, অ্যান্টিম্যালারিয়ালস এবং অ্যান্থেলমিন্টিক্স) প্রভৃতির সংস্পর্শে আসে এবং নিজেদের পরিবর্তন করে ফেলে।
- ফলস্বরূপ, ঔষধগুলি অকার্যকর হয়ে যায় এবং সংক্রমণগুলি শরীরে অব্যাহত থাকে, অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়।

কেন অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্ট এর বিষয়ে বিশ্বব্যাপি উদ্বেগ ?

১৯২৮ সালে এন্টিবায়োটিক পেনসিলিন আবিষ্কারের জন্য ১৯৪৫ সালে যখন ফ্লেমিংকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয় তখন তিনি বলেছিলেন, “The thoughtless person playing with penicillin treatment is morally responsible for the death of the man who succumbs to infection with the penicillin-resistant organism.” এই এন্টিবায়োটিকের কারণে আজ কোটি লোক বেচে যাবে। অনেক বছর পর এগুলো আর কাজ করবেনা। তুচ্ছ কারণে কোটি কোটি লোক মারা যাবে আবার।

- সাধারণ সংক্রামক রোগগুলির চিকিৎসা ব্যাহত হয় ফলে দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা,অক্ষমতা এবং মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।
- সংক্রমণের প্রতিরোধ ও চিকিৎসার জন্য কার্যকর অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালগুলির অভাবে অঙ্গ প্রতিস্থাপন, ক্যান্সার কেমোথেরাপি,ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্ট এবং বড় শল্য চিকিৎসার (উদাহরণস্বরূপ, সিজারিয়ান অপারেশন) মতো চিকিৎসা পদ্ধতিগুলো খুব উচ্চ ঝুঁকিতে পরিণত হয়।
- অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধের (AMR) ফলে হাসপাতালে দীর্ঘতর অবস্থান এবং স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় আরও বেড়ে যায়।
- বিশ্বব্যাপি জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্রমবর্ধমান মারাত্নক হুমকি যার জন্য সমস্ত সরকারী ক্ষেত্র এবং সমাজ জুড়ে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।
- Anti microbial Resistance (AMR) ব্যাকটেরিয়া,পরজীবী, ভাইরাস এবং ছত্রাকজনিত ক্রমবর্ধমান সংক্রমণের কার্যকর প্রতিরোধ এবং চিকিৎসার জন্য হুমকি স্বরুপ।
- কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক ব্যতীত বড় সার্জারী/শল্য চিকিৎসা এবং ক্যান্সার কেমোথেরাপির সাফল্য ব্যাহত হবে।

AMR প্রতিরোধের করণীয় ঃ

- অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ড্রাগসগুলোর (যেমন-অ্যান্টিবায়োটিকস, অ্যান্টিভাইরালস এবং অ্যান্টিম্যালারিয়ালস) ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- রেজিস্ট্রার্ড চিকিৎসক ছাড়া অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ড্রাগস প্রেসক্রিপশন করা যাবে না।
- পেসক্রিপশন বিহীন অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ড্রাগস বিক্রি করা বন্ধ করতে হবে।
- অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ড্রাগস প্রদানের আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রে উল্লেখিত ডোজ ও সময় অনুসারে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ড্রাগস প্রদান করতে হবে।
- সংক্রমণের উন্নতি হলেও অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ড্রাগস প্রদান বন্ধ না করে কোর্স সম্পূর্ণ করতে হবে। ডোজ যেন মিস না হয় সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে।
- অন্যের ব্যবস্থাপত্র দেখে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ড্রাগস প্রদান কখনই করা যাবে না।
- অতীতে অসুস্থতার জন্য দেয়া অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ড্রাগস চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া আবার ব্যবহার করা যাবে না।

সেশন-২২

কমিউনিটি এনিমেল হেলথ ম্যানেজমেন্ট এবং মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- কমিউনিটি এনিমেল হেলথ এর কর্মপদ্ধতি ও লক্ষ
- কমিউনিটি এনিমেল হেলথ এ্যাপ্রোচ
- মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক এর গুরুত্ব

কমিউনিটি এনিমেল হেলথ এর কর্মপদ্ধতি ঃ

- বিভিন্ন সেক্টর ও বিভাগের মধ্যে সহযোগীতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।
- গ্রাম, শহর, দেশ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।
- মানুষ, প্রাণি, উদ্ভিদ এবং তাদের পরিবেশের মধ্যে আন্তঃ সংযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।
- প্রাণি অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
- রোগ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধের উপর বেশী গুরুত্ব দিতে হবে।
- "Prevension is better than cure" প্রতিরোধ প্রতিকারের চেয়ে উত্তম ।

কমিউনিটি এনিমেল হেলথ ষ্ট্র্যাটেজির গুরুত্ব ঃ

- নতুন চ্যালেঞ্জ (Emerging diseases, outbreaks of eradicated diseases, climate change) মোকাবেলা করা।
- Community Animal Health ধারণাটি কেবল প্রাণিদের মধ্যে রোগের প্রতিরোধই অর্ন্তভূক্ত করে না, এছাড়াও প্রাণিদের স্বাস্থ্য এবং তাদের কল্যাণের জন্যও Community Animal Health গুরুত্বপূর্ণ।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্য চাহিদার সাথে তাল মেলানো।
- প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- নতুন ঔষধ, টিকা এবং নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার।

কমিউনিটি এনিমেল হেলথ এর লক্ষ্য ঃ

- জনস্বাস্থ্য এবং খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
- সকল ধরনের বাণিজ্যিক এবং অলাভজনক খামারের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা।
- দেশের অর্থনীতিতে সহযোগীতা করা এবং অর্থনীতির চাকা সচল করা।
- এনিম্যাল ওয়েলফেয়ার নিশ্চিত করা।

কমিউনিটি এনিমেল হেলথ এ্যাপ্রোচ ঃ

- গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে জনসম্পদ নিয়োগ করতে হবে ও অফিস স্থাপন করতে হবে।
- সরকারী এবং বেসরকারী (N.G.O) সংগঠনগুলোকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।
- চিকিৎসক ও খামারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।
- নিয়মিত প্রাণিস্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পরামর্শ প্রদান কর্মসূচির আয়োজন করতে হবে।
- নিয়মিত বিভিন্ন রোগের টিকাদান কর্মসূচির আয়োজন করতে হবে।
- নিয়মিত বিনামূল্যে চিকিৎসা ও কৃমিনাশক ঔষধ প্রদান কর্মসূচীর আয়োজন করতে হবে।
- গর্ভবতী প্রাণিদের জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রাণিসম্পদ অফিসের জরুরি বিভাগের কার্যক্রম ও অ্যাম্বুলেটরী সার্ভিসের ব্যবস্থা করতে হবে।
- মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিনামূল্যে প্রাণি স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- সকল ধরনের বাণিজ্যিক এবং অলাভজনক খামারের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে হবে।
- গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজননের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

- বন্যপ্রাণির জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ ঠিক রাখতে হবে এবং তাদের সংরক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- রাস্তার মালিকানাহীন ও বেওয়ারীশ প্রাণিদের চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন সংক্রামক রোগের টিকা প্রদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- যে সমস্ত রোগ প্রাণি (গরু, ছাগল,কুকুর, শুকর, পাখি ইত্যাদি) থেকে মানুষে এবং মানুষ থেকে মানুষ বা অন্য প্রাণিতে ছড়ায় সেসব রোগকে প্রাণিবাহিত রোগ বা জুনোটিক (Zoonotic) রোগ বলে। এই প্রাণিবাহিত রোগ বা জুনেটিক রোগ থেকেও রক্ষা করতে হবে সবাইকে।
- অতিথি পাখির উপর নজরদারি বৃদ্ধি করতে হবে এবং অতিথি পাখি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। অতিথি পাখি দ্বারা যে সমস্ত রোগ হয়, সেগুলোর ব্যাপারে সর্তক থাকতে হবে।
- সংক্রামক রোগে আক্রান্ত প্রাণি এবং অন্য এলাকা থেকে কোন প্রাণি আসলে সেগুলো কে প্রথমে কিছুদিন আলাদা রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- খামারীদের জীব-নিরাপত্তা (Biosecurity) ও বিভিন্ন রোগ-জীবাণু সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সকল ধরনের বাণিজ্যিক এবং পারিবারিক খামার স্থাপনে যথাযথ ভাবে জীব-নিরাপত্তা সকল বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে।
- খামার থেকে প্রাপ্ত মাংস, দুধ ও ডিমের বাজারজাতকরণ ও বাণিজ্যিককরণের জন্য সুনির্দিষ্ট কাঠামো থাকতে হবে।
- সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে তদারকি থাকতে হবে।

মূল নীতি ঃ স্বাস্থ্যসম্মত খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খামারী লাভবান হবে, এই শিল্প উন্নত হবে, কমিউনিটির প্রতিটি সদস্য সুস্থ্য থাকবে এবং জাতি হিসেবে আমরা সমান এগিয়ে যাবো।

মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক ঃ

মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক বা ভ্রাম্যমাণ প্রাণি চিকিৎসা ক্লিনিক হচ্ছে প্রাণির রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসার উন্নত সরঞ্জামসহ মোটর গাড়ির মাধ্যমে তৃণমুল পর্যয়ে উপস্থিত হয়ে চিকিৎসা সেবা খামারীর দোরগোরায় পৌঁছে দেবার একটি আধুনিক ব্যবস্থা যা দক্ষ ভেটেরিনারি চিকিৎসকটিম দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে মানুষের দোর-গোড়ায় ভেটেরিনারি চিকিৎসা পৌঁছে দেবার একটি সময়োপযুগী মাধ্যম হচ্ছে ‘মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক’। এ ব্যবস্থায় মুঠো ফোনে যোগাযোগ করে অল্প সময়ে মিলবে অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা উপযুক্ত ভেটেরিনারি চিকিৎসা।

কমিউনিটি এনিমেল হেলথ ম্যানেজমেন্টের মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিকের গুরুত্ব ঃ

- ✓ প্রত্যন্ত অঞ্চলে দ্রুততম সময়ে প্রাণির চিকিৎসা সেবা প্রদানের অন্যতম একটি মাধ্যম।
- ✓ রোগাক্রান্ত প্রাণির পরিবহন কষ্ট সাধ্য বিধায় এটি একটি উপযুক্ত সেবা পদ্ধতি।
- ✓ রোগাক্রান্ত প্রাণি অপেক্ষাকৃত কম চিকিৎসার ধকল সহ্য করে।
- ✓ রোগের বিস্তার হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম থাকে।
- ✓ প্রাণির পরিবহন ব্যয়সাধ্য হওয়ায় এটি একটি খরচ স্বাশ্রয়ী সেবা। মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিকের মাধ্যমে খামারী স্বল্প মূল্যে সেবা গ্রহণ করতে পারবে।
- ✓ ভ্রাম্যমাণ প্রাণি চিকিৎসার মাধ্যমে একজন সুদক্ষ ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শ খামারীদের উদ্বুদ্ধ করে। সার্বক্ষণিক চিকিৎসক থাকেন বিধায় চিকিৎসা পেতে কোনও সমস্যা হয় না।
- ✓ অল্প সময়ে বিস্তৃর্ন অঞ্চলে অনেক অসুস্থ প্রণিকে চিকিৎসা প্রদান করা সম্ভব হয়।
- ✓ রোগাক্রান্ত প্রাণির সুস্থতার হার এবং মৃত্যুর হার নির্ণয় করা সহজ সাধ্য হয়।
- ✓ তৃণমূল পর্যায়ে খামারীদের মাঝে প্রাণির চিকিৎসা সেবার বিস্তার ঘটে এবং প্রাণির রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।
- ✓ মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিকের অপারেশন থিয়েটার এ সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত অবস্থায় শল্য চিকিৎসা করা যায় এবং প্রাণি অপেক্ষাকৃত কম চিকিৎসার ধকল সহ্য করে।

সেশন-২৩

প্রতিষেধক টিকার গুণগতমান রক্ষায় কুল চেইন ব্যবস্থাপনা

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- কুল চেইন সর্ম্পকে ধারণা
- কুলচেইনের ধাপ ও যন্ত্রপাতিসমূহ
- কুলচেইন ব্যবস্থাপনায় টিকা পরিবহনও সংরক্ষণ
- টিকা ব্যর্থ হওয়ার কারণ এবং প্রয়োগ সতর্কতা

কুল চেইন ঃ

কোন ধরনের বিরতি ছাড়াই সব সময় অনুকূল পরিবেশে ভ্যাকসিন পরিবহন অর্থাৎ ভ্যাকসিনের উৎপাদনের সময় থেকে শুরু করে টিকাদানের পূর্ব পর্যন্ত টিকার জন্য অনুকূল ঠান্ডা পারিবেশ বজায় রাখার যে ধারাবাহিক প্রক্রিয়া তাকেই কুল চেইন বলা হয়।

কুলচেইনের ধাপ ও যন্ত্রপাতিসমূহ ঃ

কুল চেইনের ধাপ বলতে আমরা সাধারণত ভ্যাকসিন ব্যবহারের আগ পর্যন্ত কত হাত ঘুরে কিংবা কোথায় কত দিন স্টোর করে ভ্যাকসিন প্রয়োগ হচ্ছে তার ধাপকেই বুঝি। নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে দেশে উৎপাদিত টিকা এবং বিদেশ থেকে আমদানিকৃত টিকা কিভাবে একটি খামারে ব্যবহার হয় তার নমুনা প্রদান করা হলো।

	দেশীয় উৎপাদিত টিকা	বিদেশ থেকে আমদানীকৃত টীকা	
পরিবহন	↓	↓	পরিবহন
	টিকা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান	টিকা প্রস্তুতকারক দেশ	
পরিবহন	↓	↓	পরিবহন
	কেন্দ্রীয় টিকা সংরক্ষণ	শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর	
পরিবহন	↓	↓	পরিবহন
	বিভাগীয় পর্যায়	কেন্দ্রীয় কোল্ড স্টোরেজ (ঢাকা)	
পরিবহন	↓	↓	পরিবহন
	জেলা পর্যায়	বিভাগীয় ডিপো/বিক্রয় কেন্দ্র	
	↓	↓	পরিবহন
পরিবহন		আঞ্চলিক ডিপো	
	উপজেলা পর্যায়	↓	পরিবহন
		বড় ঔষধের দোকান	
পরিবহন	↓	↓	পরিবহন
	খামার	← ছোট ঔষধের দোকান	
খামার	পরিবহন		

কুল চেইনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিঃ

কুল চেইন মেইনটেনেন্স বা সংরক্ষণ করতে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি বা সাজ সরঞ্জাম প্রয়োজন হয তা নিচে উল্লেখ করা হলো:

● কোল্ড রুম ● ফ্রিজার রুম ● রেফ্রিজারেটর রুম ● ডিপ ফ্রিজার ● আইস প্যাক ● ফ্রিজার ● কোল্ড বক্স ● ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার ● রিফ্রিজারেটেড ট্রান্সপোর্ট ● থার্মোমিটার ● ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ● কোল্ড চেইন মনিটর কার্ড

কুলচেইন ব্যবস্থাপনা মনিটরিং ব্যবস্থা :-

- যদি বিদ্যুৎ চলে যায় তবে তার কারণ জানার চেষ্টা করতে হবে এবং যদি বিদ্যুৎ ৪/৬ ঘন্টার মধ্যে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে তবে দুঃচিন্তা মুক্ত থাকা যাবে। তবে কেবলমাত্র বিদ্যুৎ আসার পর পর্যন্ত রেফ্রিজারেটরের ঢাকনা বন্ধ রাখতে হবে। যদি উন্নত মানের রেফ্রিজারেটর হয় (আইস লাইন রেফ্রিজারেটর) সেই ক্ষেত্রে ১২ ঘন্টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ না থাকলেও অসুবিধা নেই।
- বিদ্যুৎ আসতে দেরী হলে তবে রেফ্রিজারেটর হতে আইস প্যাক এবং ভ্যাকসিন বের করে কোল্ড বক্সে সাজিয়ে রাখতে হবে। সঠিকভাবে ভ্যাকসিন এবং আইস সাজিয়ে রাখলে এবং ভালভাবে এয়ারটাইট হলে এক নাগারে তিন দিন পর্যন্ত টিকা কোল্ড বক্সে রাখা যায়, এতে টিকার মান নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
- সব সময় কিছু অতিরিক্ত ফ্রোজেন আইস প্যাক রাখতে হবে, যাতে বিপদের সময় কাজে লাগে।
- সব সময় অন্য প্রতিষ্ঠানের বা বাড়ীর কর্তার সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখতে হবে যাদের রেফ্রিজারেটর সুবিধা আছে। সামাজিক সম্পর্ক কোল্ড চেইন ব্যবস্থাপনায় অনেক ভূমিকা রাখে।
- সব সময় ভাল এবং দক্ষ রেফ্রিজারেটর টেকনিশিয়ান এবং ইলেকট্রিশিয়ান এর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে যাতে তারা দ্রুত ছোট সমস্যা সমাধান করে দিতে পারে।
- যারা সব সময় রেফ্রিজারেটর কিংবা জেনারেটর ভাড়া দেয় এমন লোকের সঙ্গে আলাপচারিতা রাখতে হবে।
- যে কোন জরুরী অবস্থায় বা স্বাভাবিক কিছু খুচরা যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ স্টকে রাখতে হবে। যেমন: স্টারটিং রিলে, ওভার লোড প্রটেক্টর, থার্মোস্ট্যাট, থ্রিপিন প্লাগ, থ্রিপিন সকেট, ফিউজ, বৈদ্যুতিক তার , কাট আউট, টেস্টার, স্ক্রু ডাইভার, প্লাস, স্লাই রেঞ্জ ইত্যাদি।

টিকা ব্যর্থ হওয়ার কারণ এবং টিকা ব্যবহার ও প্রয়োগে সতর্কতা ঃ

প্রধানত নিম্নোক্ত কারণে উন্নত মানের টিকা ব্যবহারের পরও টিকায় প্রাণিতে প্রতিরোধ শক্তি সৃষ্টি হয় না।

- যে রোগের টিকা দেয়া হয় যদি প্রাণি সেই রোগের জীবানু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে অর্থাৎ রোগের সুপ্তাবস্থায় থাকে।
- প্ল্যাসেন্টা বা প্রসবকালীন দুধের মাধ্যমে মা থেকে বাচ্চায় প্রাপ্ত অ্যান্টিবডিজের উপস্থিতি টিকার কার্যকারিতায় বাধা দেয়।
- কোন প্রাণি বংশগত কারণে টিকায় প্রতিরোধ গড়তে ব্যর্থ হতে পারে।
- সঠিক মাত্রায় টিকা প্রয়োগ করা না হলে।
- অত্যধিক পরজীবী আক্রমণে প্রাণির দেহে প্রোটিন সৃষ্টিতে ব্যঘাত ঘটায় এসব প্রাণিতে টিকা ভালভাবে কার্যকর হয় না।
- মৃত টিকাবীজ বা মেয়াদ উত্তীর্ণ টিকায় পর্যাপ্ত প্রতিরোধ শক্তি সৃষ্টি করতে পারে না।
- ব্যবহৃত টিকার জীবাণু স্ট্রেইন বা প্রাণির আক্রান্ত জীবাণুর স্ট্রেনের পার্থক্য হলে।
- নির্দেশনামত টিকা সংরক্ষণ করা না হলে।
- টিকা পরিবহনের সময় কোল্ড চেইন পালন করতে করতে ব্যর্থ হলে।
- দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন বা রোগাক্রান্ত প্রাণিতে টিকা প্রয়োগ করলে।
- অতিরিক্ত গরম আবহাওয়ায় টিকা প্রয়োগ করলে টিকার কার্যক্ষমতায় ব্যঘাত ঘটতে পারে, যার ফলে টিকা ব্যর্থ হয়।

টিকা ব্যবহার ও প্রয়োগে সতর্কতা ঃ

- প্রতিষেধক টিকা সবসময়ই সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান পশু-পাখিতে প্রয়োগ করতে হয়।
- রোগাক্রান্ত প্রাণিকে টিকা প্রয়োগ করা উচিত নয় কারণ এতে কাঙ্খিত মাত্রায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হয় না।
- ভেটেরিনারী ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া গর্ভবর্তী প্রাণিকে কোন টিকা দেওয়া উচিত নয়।
- টিকার বোতল বা ভায়াল কোন অবস্থাতেই সূর্যালোকে আনা ঠিক নয়।

- প্রয়োগের জন্য টিকা প্রস্তুতকরণের সময় মিশ্রণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে পাত্র, সিরিঞ্জ-নিডল, ডাইলুশনের জন্য ব্যবহৃত ডাইলুয়েন্ট, ব্যবহারকারীর হাত ইত্যাদি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত হওয়া প্রয়োজন।
- টিকা মিশ্রণের জন্য ব্যবহৃত পাত্রে জীবাণুনাশক পদার্থ ব্যবহার করা উচিত নয়।
- সকালে ও সন্ধ্যায় টিকা মিশ্রণ ও প্রয়োগ করা উচিত।
- মেয়াদ উত্তীর্ণ বা টিকার সাধারণ রং পরিবর্তিত হয়ে গেলে সে টিকা আর ব্যবহার করা যাবে না।
- টিকা পরিবহনের ক্ষেত্রে কুল চেইন বা ঠান্ডা অবস্থায় পরিবহন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- তাপ প্রতিরোধক কুল-ভ্যান বা কন্টেইনার বা ফ্লাস্কের মধ্যে বরফ দিয়ে টিকা পরিবহন করতে হবে। বরফ গলে গেলে পুনরায় বরফ দিতে হবে।
- টিকা প্রয়োগের সময় টিকা মিশ্রণের বোতল বা ভায়াল ছায়াযুক্ত স্থানে কুল বক্সের মধ্যে রাখা উচিত।
- ভাইরাস জনিত রোগ প্রতিশেক টিকা প্রয়োগকালে প্রয়োগ স্থানে পরিশ্রুত পানি দ্বারা পরিস্কার করে নিতে হবে এবং রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা যাবে না।
- টিকা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা মোতাবেক টিকা প্রদান করা উচিত।

টিকাবীজ পরিবহন ঃ
বাংলাদেশে অধিকাংশ গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি গ্রামাঞ্চলে পালন করা হয় এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বানিজ্যিক খামারগুলি টিকা উৎপাদন কেন্দ্র বা বিক্রয় কেন্দ্র থেকে বেশ দূরে অবস্থিত। যেহেতু পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা টিকা সংরক্ষণ তাপমাত্রার চেয়ে বেশি তাই পরিবহণকালে সংরক্ষণ তাপমাত্রা ঠিক রাখতে কুলভ্যান, কুলবক্স বা থার্মোফ্লাক্সে বরফসহ টিকা বহন করতে হয়। এটা cool-chain রক্ষা করার জন্য সকল টিকার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বরফ ছাড়া বহন করা টিকা ব্যবহারে কোন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে না। তাই পশু-পাখিকে এ টিকা প্রদানের পরও একই রোগে এরা আক্রান্ত হতে পারে। তাই টিকাবীজ পরিবহণের সময় নির্দিষ্ট নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। এখানে টিকা পরিবহণের নিয়মকানুন বর্ণনা করা হয়েছে। যথা–

১. টিকাবীজ পরিবহণের সময় থার্মোফ্লাক্সে বরফ দিয়ে একস্থান হতে অন্যস্থানে স্থানান্তর করতে হয়। এভাবে টিকাবীজ ১২ ঘন্টা পর্যন্ত পরিবহন করা যায়। তবে বেশি সময়ের জন্য একস্থান হতে অন্যস্থানে নেয়ার সময় পথিমধ্যে আবার বরফ দিয়ে নিতে হবে।
২. বিদেশ থেকে আমদানির সময় শুষ্ক বরফ দিয়ে ভালভাবে টিকাবীজ প্যাকিং করতে হবে। প্যাকিংকৃত টিকাবীজ জাহাজের শীতল কক্ষে (cool room) রেখে স্থানান্তর করতে হবে।
৩. থার্মোফ্লাক্স বা কুলবক্সে করে বেশি সময় ধরে পরিবহনের সময় বরফ গলে যেতে পারে। তাই এসব ক্ষেত্রে পানি ফেলে আবার বরফ ভরে নিতে হবে। টিকা প্রয়োগের জন্য বহন করা টিকা সহনীয় তাপমাত্রায় নেয়ার পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত কুলবক্স বা ফ্লাস্কে রাখতে হবে।
৪. টিকা কুলবক্সের বা ফ্লাস্কের বাইরে বের করে থইং (thawing) বা সহনীয় তাপমাত্রায় নেয়ার জন্য টিকা বের করার পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত কুলবক্সে বা ফ্লাস্কে বরফ থাকতে হবে।
৫. টিকার সঠিক পরিবহনের ওপর নির্ভর করে এর অপচয় ও ঘাটতি। খুব কম সময়ের জন্য টিকাবীজ সরবরাহের সময়ও থার্মোফ্লাক্সে বরফ দিয়ে স্থানান্তর করা হবে।

টিকাবীজ সংরক্ষণ ঃ কুল চেইন রক্ষায় টিকাবীজ সঠিকভাবে এবং সঠিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ন।

পোল্ট্রির টিকাবীজ সংরক্ষণের নিয়মাবলী ঃ

ক্রমিক	টিকার নাম	সংরক্ষণ পদ্ধতি ও মেয়াদ
১	মারেক্স টিকা	●-২০° সে. তাপমাত্রায় ১ বছর● - ৫° থেকে ০° সে. তাপমাত্রায় ৬ মাস
২	বিসিআরডিভি	●-২০° সে. তাপমাত্রায় ১ বছরের উপরে● - ৫° থেকে ০° সে. তাপমাত্রায় ৬ মাস●২° থেকে ৯°সে. তাপমাত্রায় ৪ মাস ●থার্মোফ্লাক্সে বরফসহ ১৫ দিন
৩	আরডিভি	●-২০° সে. তাপমাত্রায় ১ বছরের উপরে●-৫° থেকে ০° সে. তাপমাত্রায় ৬ মাস●২° থেকে ৯°সে. তাপমাত্রায় ৪ মাস●থার্মোফ্লাক্সে বরফসহ ১৫ দিন
৪	ফাউল পক্স	●-২০° সে. তাপমাত্রায় ১ বছর●-৫°থেকে ০° সে. তাপমাত্রায় ৫ মাস●থার্মোফ্লাক্সে বরফসহ ১৫ দিন
৫	পিজিয়ন পক্স	●-২০° সে. তাপমাত্রায় ১ বছর●-৫° থেকে ০° সে. তাপমাত্রায় ৫ মাস●থার্মোফ্লাক্সে বরফসহ ১৫ দিন
৬	গামবোরো	●-২০° সে. তাপমাত্রায় ১ বছর●-৫° থেকে ০° সে. তাপমাত্রায় ৫ মাস●থার্মোফ্লাক্সে বরফসহ ১৫ দিন
৭	ফাউল কলেরা	●৪° থেকে ৮° সে. তাপমাত্রায় ৬ মাস●থার্মোফ্লাক্সে বরফসহ ৭ দিন
৮	সালমোনেলোসিস/ফাউল টাইফয়েড	●২° থেকে ৮° সে. তাপমাত্রায় ৬ মাস●থার্মোফ্লাক্সে বরফসহ ১৫ দিন

গবাদিপশুর টিকাবিজ সংরক্ষণের নিয়মাবলী ঃ

ক্রমিক	টিকার নাম	সংরক্ষণ পদ্ধতি ও মেয়াদ
১	তড়কা	●৪° সেঃ থেকে ৮° সেঃ তাপমাত্রায় ৬ মাস
২	বাদলা	●৪° সেঃ থেকে ৮° সেঃ তাপমাত্রায় ৬ম াস
৩	গলাফুলা	●৪° সেঃ থেকে ৮° সেঃ তাপমাত্রায় ৬ মাস
৪	ক্ষুরা-বাইভালেন্ট/ট্রাইভ্যালেন্ট	●৪° সেঃ থেকে ৮° সেঃ তাপমাত্রায় ৬ মাস
৫	পিপিআর	●- ২০° সেঃ তাপমাত্রায় ১ বৎসর ● - ৫° থেকে ০° সেঃ তাপমাত্রায় ৬ মাস, ●২°-৮° সেঃ তাপমাত্রায় ১ মাস
৫	গোট পক্স	●- ২০° সেঃ তাপমাত্রায় ১ বৎসর ● - ৫° থেকে ০° সেঃ তাপমাত্রায় ৬ মাস, ●২°-৮° সেঃ তাপমাত্রায় ১ মাস
৬	জলাতংক	●- ২০° সেঃ তাপমাত্রায় ১ বৎসর ● - ৫° থেকে ০° সেঃ তাপমাত্রায় ৬ মাস, ●২°-৮° সেঃ তাপমাত্রায় ১ মাস

ভ্যাকসিন কোল্ড স্টোর রুম

ভ্যাকসিন কুল চেইন মনিটরিং

সেশন-২৪

খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ঃ বায়োগ্যাস, বায়োকম্পোষ্ট তৈরী ও ব্যবহার

সেশন শেষে যা জানা যাবে-

- খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
- বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ব্যবহারের সুবিধা
- বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট তৈরীতে ব্যবহৃত উপকরন
- বায়োগ্যাস ও প্রাকৃতিক গ্যাসের তুলনামূলক চিত্র
- বায়োকম্পোষ্ট তৈরী ও ব্যবহার

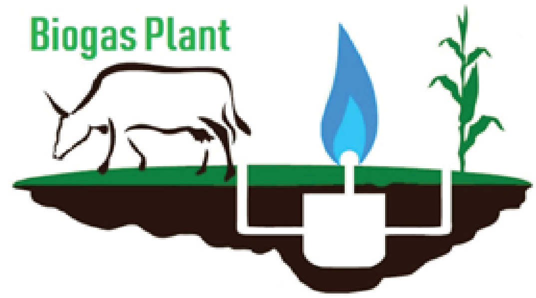

খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ঃ গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি খামারের বর্জ্য (গোবর, মূত্র, পশুখাদ্যের উচ্ছিষ্টাংশ, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা, লিটার ইত্যাদি) স্বাস্থ্যসম্মত খামার ব্যবস্থাপনায় প্রধান অন্তরায়। গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি খামারের বর্জ্য থেকে এ্যামোনিয়া, মিথেন গ্যাস তৈরী হয় যা গ্রীন হাউজকে দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে। খামারের বর্জ্য সঠিকভাবে অপসারণ এবং ডি-কম্পোজ করতে না পারলে খামারের পরিবেশ নোংরা, দুর্গন্ধ এবং মশা মাছির উপদ্রব দেখা দেয় ফলে একদিকে যেমন প্রাণির স্বাস্থ্য হুমকির মধ্যে পড়ে অন্য দিকে এলাকার পরিবেশ দূষিত হওয়ায় মানুষের স্বাস্থ্যও হুমকির মধ্যে পড়ে।গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি খামারের বর্জ্য যদি বায়োগ্যাস, বায়ো-কম্পোষ্ট, ভার্মি কম্পোষ্ট প্রভৃতি উৎপাদনে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় তবে খামারের বর্জ্য জঞ্জাল থেকে সম্পদে রুপান্তরিত হয়। এতে একদিকে যেমন পরিবেশ রক্ষা হয় অন্যদিকে জৈব জ্বালানী, জৈব সার উৎপাদন হয় যা খামার ব্যবস্থাকে আরও উন্নত ও লাভবান করে তোলে।

গবাদিপশুর ও পোল্ট্রি খামারের বর্জ্য দুইভাবে ব্যবহার করা যায়- ১. বায়োগ্যাস তৈরীর মাধ্যমে ২. বায়োকম্পোষ্ট তৈরীর মাধ্যমে।

বায়োগ্যাস কী?

পচনশীল যে কোন জৈব পদার্থ গরুর গোবর, মুরগির বিষ্ঠা প্রভৃতি বায়ুশূন্য অবস্থায় রাখলে ব্যাক্টেরিয়াল ডি-কম্পোজের ফলে যে পরিচ্ছন্ন জ্বালানী গ্যাস উৎপন্ন হয় তাই বায়োগ্যাস। এই গ্যাস প্রধানত: মিথেন (CH4) গ্যাস। যখন গোবর/বিষ্ঠা পানির সাথে মিশিয়ে বায়ো-ডাইজেস্টারে বায়ুশূণ্য অবস্থায় উপযুক্ত তাপমাত্রায় রাখা হয় তখন অনুজীব এর ক্রিয়ার ফলে গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস রান্নার জন্য খুবই কার্যকর।

উৎপন্ন তাপের হিসেবে ১ ঘন মিটার বায়োগ্যাস (৬০% মিথেন) ০.৭৬ লিটার কেরোসিন, ৫.২ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ, ৪.৮ কেজি জ্বালানী কাঠ এবং ৮.৬ কেজি খড়ের সমান তাপ উৎপন্ন করে।

বায়োগ্যাসকে জৈব গ্যাস বলা হয়। বায়োগ্যাস প্রধানত মিথেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস এর মিশ্রণ। তবে অন্যান্য গ্যাসেরও সামান্য উপস্থিত পাওয়া যায়। নিচের টেবিলে জৈব গ্যাস ও প্রাকৃতিক গ্যাসের গঠনের একটি তুলনামূলক চিত্র দেওয়া হলো।

বায়োগ্যাস ও প্রাকৃতিক গ্যাসের তুলনামূলক চিত্র ঃ

পদার্থ	শতকরা হার	
	প্রাকৃতিক গ্যাস	বায়োগ্যাস
মিথেন	৯৫-৯৮	৬০-৭০
কার্বন-ডাই-অক্সাইড	০.১-০.২	৩০-৪০
হাইড্রোজেন	-	২-২.৫
নাইট্রোজেন	০.৪	১-১.৫
অক্সিজেন	০.১	০.৩-০.৪
হাইড্রোজেন সালফাইড	-	০.১-০.২

বায়োগ্যাস ব্যবহারের সুবিধাসমূহ ঃ

১। পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ জ্বালানী পাওয়া যায় ২। ধোঁয়া হয় না ফলে পাতিল এবং রান্নাঘর কালো হয় না ৩। কেরোসিন, লাকড়ি বা খড়কুটো লাগে না ফলে জ্বালানীর খরচ বাঁচে ৪। সময় বাঁচে এবং রান্নার পাশাপাশি অন্য কাজও করা যায় ৫। লাকড়ির চুলায় রান্না করলে যে ধোঁয়া হয় তা স্বাস্থের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এতে চোখ জ্বালা করে এবং শ্বাসকষ্টসহ শ্বাসনালী ও ফুসফুসের নানা জটিল রোগ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ক্ষেত্রে বায়োগ্যাস স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ ৬। পরিবেশ দূষণ হয় না ৭। বায়ো-স্লারি জৈব সার হিসেবে ব্যবহারে অধিক ফসল পাওয়া যায়। ৮। হ্যাজাক লাইট জ্বালানো যায়। ৯। জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনও করা যায় ১০। বাড়ী ও দোকানে গ্যাস সরবরাহ করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়।

বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট করতে কি কি লাগে?

গোয়ালঘর অথবা রান্নাঘরের আশেপাশে ২০০ বর্গফুটের মতো খোলামেলা জায়গা থাকতে হবে যেখানে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট বসানো যায়। বাড়ির মালিকের কমপক্ষে ৩টি গরু অথবা ২০০টি লেয়ার মুরগী থাকতে হবে।

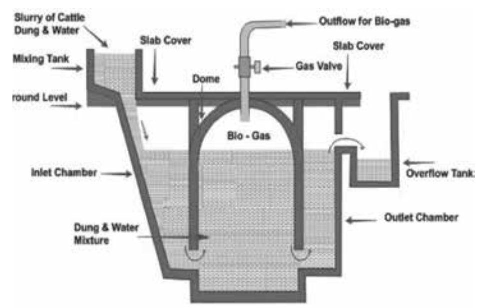

Fixed Dome type Bio-gas Plant

বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট তৈরির আনুমানিক খরচ ঃ

পরিবারের লোকসংখ্যা ও গরু বা মুরগির সংখ্যার উপর ভিত্তি করে প্ল্যান্টের আকার ছোট বড় হতে পারে, সেক্ষেত্রে নির্মাণ খরচও কম বেশি হবে। মোট নিমার্ণ ব্যয়ের মধ্যে আছে নির্মাণ সামগ্রী, নিমার্ণ শ্রমিক মজুরি, চুলা ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ ক্রয় বাবদ ব্যয় এবং সার্ভিস চার্জ/ইঞ্জিনিয়ারিং ফি।

আকার ভেদে বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের খরচ ও ব্যবহার নিম্নের টেবিলে বর্ণিত হলো ঃ

প্ল্যান্টের আকার (ঘনমিটার)	কত ঘন্টা জ্বলে	প্রতিদিন কত গোবর লাগে (কেজি)	কয়টি গরু থাকতে হবে	প্ল্যান্ট স্থাপনের আনুমানিক খরচ (হাজার টাকা)
২.০	৩-৪	৪০	৩	৪০-৪৫
২.৪	৪-৫	৬০	৪	৫০-৫৫
৩.২	৬-৮	৮০	৬	৫৫-৬৫
৪.৮	১০-১২	১২০	৮	৬৫-৭৫

বর্তমানে ইট, সিমেন্ট, বালু দিয়ে মাটির নিচে যে বায়োগ্রাস প্লান্ট তৈরী করা হয় ব্যয় বহুল এবং নষ্ট হলে মেরামত করা কষ্টকর। বতর্মানে প্লাষ্টিক ফাইবার দিয়ে নির্মিত বিভিন্ন সাইজের প্লান্ট দেশে তৈরী এবং ব্যবহার হচ্ছে।

ফাইবার বায়ো ডাইজেস্টার এর সুবিধাসমূহ ঃ

১. দ্রুত ও সহজে স্থাপন করা যায়।
২. স্থায়িত্বকাল ন্যূনতম ৩০ বছর।
৩. লিকেজ/ফাটল ধরার সম্ভাবনা কম।
৪. অল্প জায়গায় স্থাপনযোগ্য।
৫. সহজে স্থানান্তরযোগ্য।
৬. ওজনে হালকা ও পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

ফাইবার বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট

স্লারি ব্যবহারে বায়ো কম্পোস্ট তৈরি পদ্ধতি ঃ

বাড়ীতে প্রাপ্য বিভিন্ন জৈব পদার্থ যেমন গাছের পাতা, খড়, রান্না ঘরের আবর্জনা ইত্যাদি স্লারির সঙ্গে মিশিয়ে কম্পোস্ট তৈরি করা হয়। নিম্ন পদ্ধতিতে পিটে কম্পোস্ট তৈরি করা যায় ঃ

পিট বা গর্তের আকৃতি ঃ ৬ ফুট লম্বা, ৩ ফুট প্রস্থ ও ৩ ফুট গভীরতা সম্পন্ন ৩টি পিট পাশাপাশি তৈরী করতে হবে। পিটগুলি স্থায়ীভাবে ইট দিয়েও তৈরী করা যায়। পিটগুলি সেডের নীচে হবে তৈরী করতে হবে। পিটের আকার প্রাপ্ত বর্জ্যের পরিমাণের উপর নির্ভর করবে।

১। পিটের তলায় শুকনো বিভিন্ন জৈব পদার্থ যেমন খড়, কচুরীপানা, গাছের শুকনো পাতা, বাড়ির আর্বজনা ইত্যাদি ১৫-২০ সে.মি পুরো করে বিছিয়ে দিতে হবে। এই সকল শুকানো জৈব পদার্থ বায়ো-স্লারি জলীয় অংশ শুষে নেয় এবং বায়ো-স্লারিতে বিদ্যমান যে সকল উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদান চুয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করে।

২। পিটের তলায় বিছিয়ে দেওয়া শুকনো জৈব পদার্থের উপর বায়ো-স্লারি জমা করতে হবে। যদি সম্ভব হয় স্লারি সমানভাবে জৈব পদার্থের উপর ছড়িয়ে দিলে ভাল হয়।

৩। বায়ো-স্লারি সমান ভাবে ছড়িয়ে দেবার পর এর (স্লারির) উপর ৪ সে.মি ছোট করে কাটা খড় বা অন্য কোন শুকানো জৈব পদার্থ বিছিয়ে দিতে হবে। খড় বা জৈব পদার্থের আবরণ বায়ো-স্লারিকে রোদে শুকানো থেকে রক্ষা করে গাছের খাদ্য উপাদান নষ্ট হওয়া রোধ করে।

৪। বায়োগ্যাস প্লান্টের ডাইজেস্টার এর স্লারি নির্গত হওয়ার পাইপ বা ড্রেন পিটগুলির সাথে যুক্ত করতে হবে।

৪। এভাবে পর্যায়ক্রমে বায়ো-স্লারি বা শুকনো খড় বা জৈব পদার্থ স্তরে স্তরে ছড়িয়ে পিট সম্পূর্ণভাবে ভর্তি করতে হবে। ভতিকৃত স্লারি ও খড় বা জৈব পদার্থের উচ্চতা পিটের মাটির লেভেল থেকে ১৫-২০ সে.মি উঁচু হওয়া দরকার।

৫। পিট সম্পূর্ণ ভর্তি হয়ে গেলে একটি পলিথিন পাতলা স্তরের মাটি দিয়ে ঢেকে এক মাসের জন্য রেখে দিতে হবে।

৬। একইভাবে ২য় পিটে বর্জ্য ফেলা শুরু করতে হবে এবং পিট পূর্ন হলে ১ মাসের জন্য ঢেকে রাখতে হবে।

৭। এক মাস পর প্রথম পিটের বর্জ্যকে ৩য় পিটে স্থানান্তর করতে হবে। স্থানান্তরের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন উপরের বর্জ্য নীচে যায় এবং নীচের বর্জ্য উপরে আসে। পিটের উপর আগের মত পলিথিন বা হালকা ভাবে মাটির চাপা দিয়ে ১মাস রাখতে হবে। ১মাস পর ৩য় পিটের বর্জ্য কম্পোষ্ট সারে পরিনত হবে এবং তা পিট থেকে বের করে হালকা রোদে শুকিয়ে প্যাকেটজাত করতে হবে।

৮। একইভাবে ১ মাস পর ২য় পিটের বর্জ্য ৩য় পিটে স্থানান্তর করতে হবে এবং ১মাসের জন্য ঢেকে রাখতে হবে।

৯। এইভাবে ফাঁকা পিটে বর্জ্য জমা, বর্জ্য পূর্ন হলে ১ মাসের জন্য ঢেকে রাখা এবং পুনরায় অন্য পিটে স্থানান্তর করে আরও ১ মাস সংরক্ষণের মাধ্যমে কম্পোষ্ট তৈরীর প্রক্রিয়া চলমান থাকবে।

১০। পিটের উপর চাল তৈরী করলে তা বৃষ্টির পানি প্রবেশ রোধ করবে এবং অতিরিক্ত সূর্যের আলো থেকে রক্ষা করবে। লতাজাতীয় সবজি আবাদে এই চাল জাংলা/মাচা হিসাবে ব্যবহারে মাধ্যমে চাল তৈরীর অতিরিক্ত খরচ পুষ্টিয়ে নেয়া যায়।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ঃ

- জৈব সার তৈরির মাধ্যমে খামারে উৎপাদিত বর্জ্যের ব্যবহার ও পরিবেশ দূষণ রোধ করা যায়।
- যাবতীয় রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু ও আগাছার বীজ ধ্বংস করা যায়।
- জৈব্ সার তৈরীর ফলে বর্জ্যের দূর্গন্ধ দূর করা যায়।
- সহজে প্যাকিং ও পরিবহণ করা যায়।
- কৃষকের ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।
- জৈব সার বিক্রি করে খামারের আয় বৃদ্ধি করা যায়।
- তেমন কোন বাড়তি খরচের প্রয়োজন হয় না।

সেশন-২৫

‘স্মার্ট লাইভষ্টক ভিলেজ’ আইডিয়া

সেশন শেষে যা জানা যাবে -

- স্মার্ট লাইভষ্টক ভিলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্য
- স্মার্ট লাইভষ্টক ভিলেজ এর বৈশিষ্ট্য ও গঠন প্রক্রিয়া
- স্মার্ট লাইভষ্টক ভিলেজ
- স্মার্ট লাইভষ্টক ভিলেজ গঠনের টাইমফ্রেম
- স্মার্ট লাইভষ্টক ভিলেজ গঠনে সম্প্রসারণ কার্যক্রম

স্মার্ট লাইভষ্টক ভিলেজ (SLV) স্থাপনের উদ্দেশ্য ঃ

১। প্রাণিসম্পদের সকল সেবা প্যাকেজ আকারে গ্রামে পৌছানো।
২। কৃষক ও খামারীদের প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা।
৩। কৃষক ও খামারিদের মাঝে Good Livestock Practice বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো।
৪। নিরাপদ দুধ, মাংস, ডিম উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগনের পুষ্টি উন্নয়ন।
৫। এসডিজি বাস্তবায়নে পরিবেশ বান্ধব প্রাণিসম্পদ সমৃদ্ধ গ্রাম প্রতিষ্ঠা।

স্মার্ট লাইভষ্টক ভিলেজ (SLV) এর বৈশিষ্ট্য ঃ

১। গ্রামের সকল খামারীদের আধুনিক প্রাণিসম্পদপালনে সম্যক জ্ঞান থাকবে।
২। গ্রামের সকল খামারের ব্যবস্থাপনা হবে স্বাস্থ্যসম্মত।
৩। খামারীগন নিজ খামারে বিভিন্ন প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি ব্যবহার করবে।
৪। গ্রামে প্রাণিসম্পদের প্রযুক্তিসমুহের ডেমো প্রদর্শন করা হবে।
৫। গ্রামের সকল খামারীর উৎপাদিত দুধ, ডিম, মাংস হবে নিরাপদ ।
৬। গ্রামের সকল পরিবারদুধ, ডিম ও মাংস গ্রহনে সচেতন হবে।
৭। খামারীগন তাদের প্রাণিসম্পদের সকল তথ্য সংরক্ষণ করবে।
৮। গ্রামে একটি প্রাণিসম্পদ গ্রাম উন্নয়ন কমিটি থাকবে।

স্মার্ট লাইভষ্টক ভিলেজ (SLV) গঠন প্রক্রিয়া ঃ

কার্যক্রম-১) গ্রাম নির্বাচন ও বেজ লাইন সার্ভে ঃ

- উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কর্তৃক তাঁর সকল কর্মকর্তা ও মাঠসহকারীদের সাথে আলোচনা করে প্রতিটি ইউনিয়নে প্রাথমিক পর্যায়ে একটি করে গ্রাম নির্বাচন করা হবে।
- কার্যক্রমের শুরুতে নির্বাচিত গ্রামের সকল পরিবারের প্রাণিসম্পদ বিষয়ক ও পারিবারিক পুষ্টি সর্ম্পকীত বেইজ লাইন সার্ভে করা হবে।

কার্যক্রম-২) স্মার্ট লাইভষ্টক ভিলেজ বাস্তবায়ন কমিটি গঠন ঃ

- গ্রামের কৃষক, খামারী, ওয়ার্ড মেম্বার, স্কুল শিক্ষক, মসজিদের ইমাম এবং প্রাণিসম্পদ দপ্তরের প্রতিনিধি নিয়ে ১০ সদস্যের একটি ‘স্মার্ট লাইভষ্টক ভিলেজ বাস্তবায়ন কমিটি’ গঠন করা হবে। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হবেন কমিটির সভাপতি এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রাণিসম্পদ বিভাগের প্রতিনিধি হবেন সদস্য সচিব।

- নির্বাচিত গ্রামের প্রবেশদ্বারে গ্রামের সাধারন ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্য সম্বলিত একটি ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হবে।

কার্যক্রম-৩) প্রযুক্তিভিত্তিক খামারী নির্বাচন ঃ

- গ্রামে প্রাণিসম্পদ রয়েছে এমন সকল পরিবারকেই প্রাণিসম্পদ পরিবার বা খামারী হিসেবে গন্য করা হবে। সাধারনভাবে প্রাণিসম্পদ পালনকারীদের পারিবারিক খামারী এবং খামার আকারে প্রাণিসম্পদ পালনকারীদের বানিজ্যিক খামারী হিসেবে গন্য করা হবে।
- নির্বাচিত গ্রামে Good Livestock Practice(GLP) এর আওতায় প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহীএবং উপযোগীতার ভিত্তিতে নূন্যতম ২০-২৫ জন খামারী নির্বাচন করা হবে।যাদেরকে GLP Farmer বলা হবে।

কার্যক্রম-৪) GLP খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তির ডেমো স্থাপন ঃ

- নির্বাচিত খামারীদের প্রযুক্তি ব্যবহার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে ১/২ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
- নির্বাচিত খামারীদের বাড়ীতে বিভিন্ন প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তির ব্যবহার ও ডেমো প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে। ডেমো সমুহ- ইউএমএস ব্যবহার, উন্নতজাতের গাভী পালন, উন্নত জাতের ঘাস চাষ, হাইড্রোফোনিক ফডার উৎপাদন, মাচায় ছাগল পালন, কাফ পেন ব্যবহার, গবাদিপশু হৃষ্টপুষ্টকরন, সাইলেজ তৈরী, দেশী অর্গানিক মুরগি পালন, বায়োগ্যাস ব্যবহার, কম্পোষ্টিং, ভার্মি কম্পোষ্টিং, ভিজা খড় সংরক্ষন।ছাগল পালন, ভেড়া পালন, ব্রয়লার পালন, লেয়ার পালন, কবুতর পালন, কোয়েল পালন, হাঁস পালন, টার্কি পালন, বায়োগ্যাস প্লান্ট, বায়ো কম্পোষ্ট, ভার্মি কম্পোষ্ট।
- সংশ্লিষ্ট খামারীদের প্রাণিসম্পদ সেবা কার্ড প্রদান করা হবে। সেবা প্রদানের সকল তথ্য সেবা কার্ডে লিপিবদ্ধ করা হবে। প্রযুক্তি ব্যবহারকারী প্রত্যেক খামারীদের খামারে বাড়িতে প্রযুক্তি সম্পর্কীত সাইনবোর্ড স্থাপন করা হবে।

কার্যক্রম-৫) গ্রামের খামারীদের প্রাণিসম্পদ সেবা প্রদান ক্যাম্প স্থাপন ঃ

- খামারীদের প্রাণিসম্পদ সেবা প্রদানে গ্রামের লোকজনের সাথে আলোচনা করে গ্রামে একটি নির্দিষ্ট স্থান/বাড়ি নির্দ্ধারন করা হবে। সেটি প্রাণিসম্পদ সেবা ক্যাম্প হিসেবে পরিচালিত হবে।
- সকল প্রকার প্রাণিসম্পদ সেবা বিশেষ করে গবাদিপশুর ও হাঁস-মুরগির টিকা প্রদান, চিকিৎসা সেবা, কৃত্রিম প্রজনন, ডিওর্য়ামিং, পরামর্শ প্রভৃতি সেবা সপ্তাহে অন্তত: একদিন উক্ত ক্যাম্পের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

কার্যক্রম-৬) নিরাপদ প্রাণিজাত পণ্য উৎপাদন ও বিপননে খামারীদের প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান ঃ

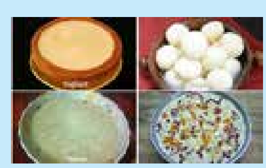

- গ্রামের খামারীদের উৎপাদিত দুধ, ডিম, মাংস হবে নিরাপদ ও অর্গানিক। প্রাণিজাত পণ্যের মান উন্নয়ন ও মূল্য সংযোজনে দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদন ও বিপননে খামারীদের এবং স্থানীয় বিক্রেতাদের আধুনিক প্রযুক্তি সর্ম্পকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
- খামারীদের উৎপাদিত দুধ থেকে বিভিন্ন দুগ্ধজাত পণ্য তৈরী, এন্টিবায়োটিক ও রাসায়নিকমুক্ত ডিম ও মাংস উৎপাদনে খামারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হবে।

কার্যক্রম-৭) প্রাণিসম্পদ মাঠ স্কুল স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদান ঃ

- নির্বাচিত গ্রামে একটি প্রাণিসম্পদ মাঠ স্কুল স্থাপন করা হবে এবং সপ্তাহে একদিন গ্রামের কৃষক ও খামারীদের নিয়ে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, পারিবারিক পুষ্টি, ভ্যালুএডেড প্রাণিজাত পণ্য উৎপাদন ও বিপনন বিষয়ে আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান করা হবে।
- গ্রামের সকল প্রাণিসম্পদ কৃষক ও খামারীদের পর্যায়ক্রমে প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

কার্যক্রম-৮) ঃ গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ঃ

- গ্রামের পরিবেশ দূষনরোধে খামারীদের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হবে।
- খামারীদের বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন,বায়ো কম্পোষ্ট ও ভার্মি কম্পোষ্ট তৈরীতেবিশেষ উদ্যোগ গ্রহন করা হবে।

কার্যক্রম-৯) ঃ উন্নত জাতের ঘাষ চাষ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহন ঃ

- গ্রামের খামারীদের অব্যবহৃত জমি, বাড়ির পাশে, পুকুর পাড়ে, রাস্তার ধারে উন্নত জাতের ঘাস চাষের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- উৎপাদিত কাঁচা ঘাস দিয়ে সাইলেজ ও হে তৈরীর প্রযুক্তি ব্যবহারে খামারীদের উৎসাহিত করা হবে।

কার্যক্রম-১০) ঃ গ্রাম পরিদর্শন, মনিটরিং ও তথ্য সংরক্ষণ ঃ

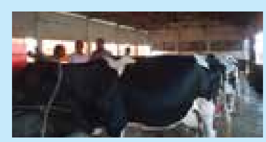

- উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও ভেটেরিনারি সার্জন নিয়মিত উক্ত গ্রাম পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান করবেন।
- স্মার্ট লাইভষ্টক ভিলেজের কার্যক্রম সম্পর্কে অন্য গ্রামের আগ্রহী খামারী, স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের অবহিত ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে।
- স্মার্ট লাইভষ্টক ভিলেজ কার্যক্রমের সকল তথ্য 'স্মার্ট লাইভষ্টক ভিলেজ সংক্রান্ত রেজিষ্টারে' সংরক্ষণ করা হবে।
- লাইভষ্টকভিলেজের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রিন্ট, ইলেকট্রোনিক এবং সোস্যাল মিডিয়াতেও প্রচার করা হবে।

কার্যক্রম-১১) পুষ্টি সচেতনতা ও দৈনন্দিন দুধ, ডিম, মাংস গ্রহনের হার বৃদ্ধিতে সচেতনতা বৃদ্ধি।

- গ্রামের সকল পরিবারের পুষ্টি নিশ্চিত করনে নিয়মিত দুধ, মাংস ও ডিম গ্রহনে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করা হবে।

কার্যক্রম-১২) লাইভষ্টক ভিলেজে গ্রুপ বা সমিতি গঠন ঃ

- গ্রামের খামারীদের নিয়ে ''নিরাপদ প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ও বিপনন'' বিষয়ে একটি গ্রুপ বা সমিতি গঠন করা হবে। সমিতিটি সমবায়/সমাজসেবা বিভাগ কর্তৃক নিবন্ধন করা হবে।
- সমিতির মাধ্যমে গ্রামের সকল খামারীদের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির নিরাপদ উৎপাদন, সংরক্ষণ, পরিবহন ও বিপননসহ খামারীদের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

কার্যক্রম-১৩) উন্নয়ন/প্রযুক্তি মেলায় অংশগ্রহন ঃ

স্মার্ট লাইভষ্টক ভিলেজেরখামারীদের কার্যক্রম, ব্যবহৃত প্রযুক্তি, উৎপাদিত পণ্য ও সেবা পদ্ধতি নিয়ে প্রতি বছর সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/উপজেলা পরিষদে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন/প্রযুক্তি মেলায় অংশগ্রহন ওডেমো প্রদর্শণ করা হবে।

কার্যক্রম-১৪) ঃ লাইভষ্টক ভিলেজের কার্যক্রম মূল্যায়ণ ও খামারীদের পুরস্কৃতকরন ঃ

প্রতিবছর জুন/জুলাই মাসে লাইভষ্টক ভিলেজের কার্যক্রম মূল্যায়ণ করা হবে এবং ভালো খামারীদের পুরষ্কৃত করা হবে।

*উপরোক্ত কার্যক্রমগুলি শুরু থেকে ৬ মাসের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা হবে। কার্যক্রম শুরুর ৬মাস পরে সার্বিক মূল্যায়ন করে গ্রামটিকে স্মার্ট লাইভষ্টক ভিলেজ হিসেবে চিহ্নিত করা হবে এবং গ্রামে একটি সাধারন সভা আয়োজনের মাধ্যমে তা প্রকাশ ও প্রচার করা হবে। সেখানে প্রাণিসম্পদ বিভাগের উর্দ্ধতন কর্তা ব্যাক্তি, স্থানীয় জন প্রতিনিধি, অন্য এলাকার আগ্রহী খামারীগন উপস্থিত থাকার ব্যবস্থা করা হবে। স্মার্ট লাইভষ্টক ভিলেজের কার্যক্রম চলমান থাকবে।

পরবর্তী মাসেপ্রতি ইউনিয়নেনেতুন আরও একটি করে গ্রাম নির্বাচন করে স্মার্ট লাইভষ্টক ভিলেজ গঠনের কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।

স্মার্ট লাইভষ্টক ভিলেজ গঠনের টাইম ফ্রেম ঃ

ক্র.নং	কার্যক্রম	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টে.	অক্টো.	নভে.	ডিসে.	জানুয়ারী
১.	স্মার্ট লাইভষ্টক ভিলেজ নির্বাচন এবং বেজ লাইন সার্ভে							
২.	স্মার্ট লাইভষ্টক ভিলেজ বাস্তবায়ন কমিটি গঠন এবং কার্যক্রম উদ্বোধন							
৩.	প্রযুক্তি ডেমো স্থাপনে খামারী নির্বাচন এবং প্রশিক্ষণ প্রদান							
৪.	খামারীদের বাড়িতে প্রযুক্তির ডেমো স্থাপন/উন্নয়ন							
৫.	প্রাণিসম্পদ সেবা ক্যাম্প এবং প্রাণিসম্পদ মাঠ স্কুল স্থাপন							
৬.	লাইভষ্টক ভিলেজে গ্রুপ বা সমিতি গঠন							
৭.	কার্যক্রম মূল্যায়ণ এবং স্মার্ট লাইভষ্টক ভিলেজ ডিক্লারেশন। পরবর্তী গ্রাম নির্বাচন ও কার্যক্রম শুরু।							

স্মার্ট লাইভষ্টক ভিলেজ বাস্তবায়নে লজিষ্টিক সাপোর্ট ঃ

১.	লোকবল (সার্ভে, প্রাণিসেবা প্রদান,প্রশিক্ষণ প্রদান, তথ্য সংরক্ষণ, মনিটরিং)	সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপসহকারী/মাঠসহকারী/প্রকল্পের মাঠ কর্মী।
২.	উপকরন সরবরাহ (টিকা,ঔষধ, ঘাসের কাটিং, হেলথ্ কার্ড, লিফলেট, বুকলেট, পোষ্টার, রেজিষ্টার)	বিভাগীয়/চলমান প্রকল্প হতে সরবরাহকৃত
৩.	টিকা, ঔষধ, সিমেন	রাজস্ব/চলমান প্রকল্প
৪.	প্রশিক্ষণ ব্যয়	রাজস্ব/চলমান প্রকল্প/উপজেলা পরিষদ ফান্ড।
৫.	ডেমো উপকরন ও স্থাপন ব্যয়	রাজস্ব/চলমান প্রকল্প/উপজেলা পরিষদ ফান্ড।

স্মার্ট লাইভস্টক ভিলেজ বাস্তবায়নে স্মার্ট সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ঃ
(Smart Extension Service for Smart Livestock Village)

স্মার্ট লাইভস্টক ভিলেজ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন স্মার্ট এক্সটেনশন সার্ভিস। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা বা গাইডলাইন নেই বিধায় গতানুগতিক পদ্ধতিতে সম্প্রনারণ সেবাপ্রদান স্মার্ট লাইভস্টক ভিলেজ গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবেনা। এ লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে কার্যকর সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে 'স্মার্ট লাইভস্টক এক্সটেনশন সার্ভিস' নামে একটি সম্প্রসারণ কৌশল প্রনয়ন করা হয়েছে যা স্মার্ট লাইভস্টক ভিলেজ গঠন কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ উপজেলার সার্বিক সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিশেষ সহায়ক হবে। কৌশলটি ইতোমধ্যে পাইলট আকারে খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। এতে বিভাগীয় সম্প্রসারণ কার্যক্রমে গতি সঞ্চারিত হয়েছে, জনসাধারন ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে বিভাগের কর্ম তৎপরতা লক্ষণীয় হয়েছে এবং বিভাগীয় কাজের জবাবদিহিতা অনেকাংশে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

স্মার্ট লাইভস্টক এক্সটেনশন সার্ভিস' বাস্তবায়ন কৌশল ঃ
উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ৫টি ধাপ অনুসরন করা হবে।

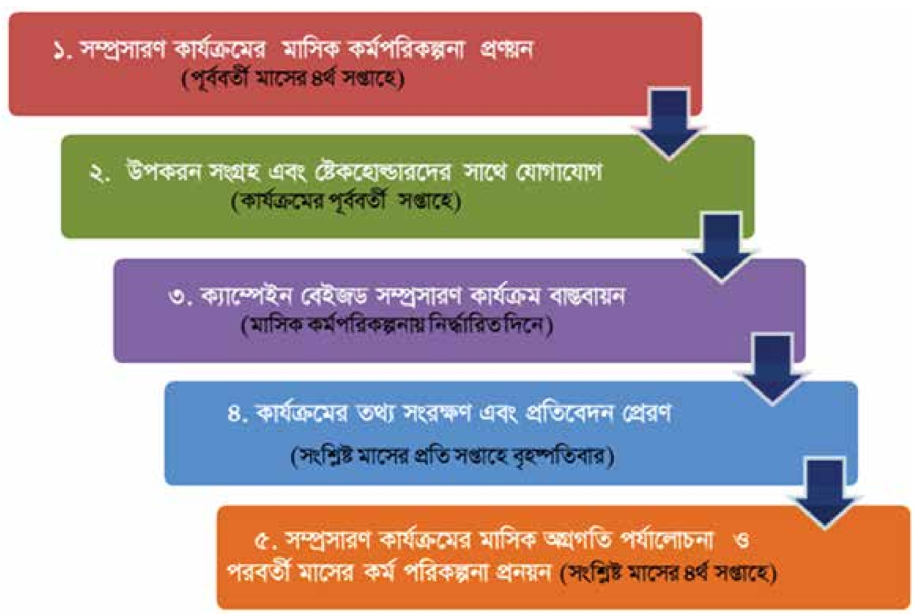

কার্যক্রম-১. সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে মাসিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ঃ

▸ ইউএলওগণ সম্প্রসারন কার্যক্রমের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার আলোকে দপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও মাঠসহকারীদের নিয়ে প্রতিমাসের ৩য় সপ্তাহে (বৃস্পতিবার) পরবর্তী মাসের মাসিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করবেন।
▸ মাসিক পরিকল্পনা হবে গ্রামভিত্তিক। ▸ মাসিক পরিকল্পনায় (সাপ্তাহিক কর্মসূচী অনুযায়ী ছক-১) সকল সম্প্রসারণ কার্যক্রম অর্ন্তভূক্ত থাকবে।
▸ উপজেলার মাসিক কর্মপরিকল্পনা ইউএলও অনুমোদন করবেন এবং সংশ্লিষ্ট সকল স্থানে প্রেরন করবেন। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ইউ এলওগন এবং উপজেলার কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ডিএলওগন নিজ নিজ অগ্রীম ভ্রমন সূচী প্রনয়ন করবেন।

প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারন কার্যক্রমের মাসিক কর্ম পরিকল্পনা ছক

তারিখ	বার	সম্প্রসারন কার্যক্রম-১				সম্প্রসারন কার্যক্রম-২				সম্প্রসারন কার্যক্রম-৩			
		কার্য ক্রম	ইউনিয়ন	গ্রাম	বাস্তবায়ন কারী	কার্য ক্রম	ইউনিয়ন	গ্রাম	বাস্তবায়ন কারী	কার্য ক্রম	ইউনিয়ন	গ্রাম	বাস্তবয়ন কারী
											উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা		

(সম্প্রসারণ কাজের সাপ্তাহিক সূচী)

বার	দিবসের নাম	সম্প্রসারণ কার্যক্রম
রবিবার	ভ্যাকসিনেশন ডে	গবাদিপশু-হাঁস মুরগির টিকা প্রদান, ভিটামিন ক্যাম্পেইন, ডিওয়ার্মিং কার্যক্রম, উপকরণ বিতরণ। পারিবারিক প্রাণিসম্পদ পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান।
সোমবার	সার্ভিলেন্স ডে	পশু-পাখির বাণিজ্যিক খামার, হাট বাজার, কিচেন, এগ্রোভেট কারখানা, পশু খাদ্যের দোকান পরিদর্শন, ডিজিজ সার্ভিলেন্স, প্রজেনী রেকর্ডিং, পশু-পাখির পরিসংখ্যান ও উৎপাদন তথ্য সংগ্রহ। পারিবারিক প্রাণিসম্পদ পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান।
মঙ্গলবার	মোটিভেশন ডে	উঠান বৈঠক, মাঠভ্রমণ, উদ্বুদ্ধকরণ সভা, মাঠদিবস, ডেমো প্রদর্শন, উপকরণ বিতরণ, ঘাস চাষ সম্প্রসারণ। মোবাইল [illegible] পরিচালনা। পারিবারিক প্রাণিসম্পদ পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান।
বুধবার	ক্লিনিক্যাল ডে	মোবাইল ভেটেরিনারি ক্যাম্প পরিচালনা, পশু-পাখির নমুনা সংগ্রহ ও ল্যাবে প্রেরণ। বিশেষ টিকা প্রদান কার্যক্রম। [illegible] প্রাণিসম্পদ পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান।
বৃহস্পতিবার	মিটিং এন্ড রিপোর্টিং ডে	পূর্বাহ্নে- গবাদিপশু-হাঁস মুরগির টিকা প্রদান, পারিবারিক প্রাণিসম্পদ পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান। অপরাহ্নে-সাপ্তাহিক সভা ও রেজিষ্টার হালনাগাদকরণ।

(সাপ্তাহিক সূচী অনুযায়ী সম্প্রসারণ কার্যক্রম)

২. সম্প্রসারণ উপকরন সংগ্রহ এবং ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগ ঃ

▸ মাসিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সপ্তাহ ভিত্তিক প্রয়োজনীয় উপকরন সংগ্রহ করতে হবে। ▸ সম্প্রসারণ কার্যক্রম সুষ্ঠুবাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। ▸ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কৃষক, খামারী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন, বিভাগীয় উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ ও সংবাদকর্মীসহ সকল ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ করতে হবে। ▸ সম্প্রসারণ কার্যক্রম সর্ম্পকে ষ্টেকহোল্ডারদের অবহিতকরনসহ কার্যক্রমে অংশগ্রহনের আমন্ত্রন জানাতে হবে।

(সম্প্রসারণ উপকরন)

(সম্প্রসারণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত স্টেকহোল্ডার)

কার্যক্রম -৩.ক্যাম্পেইন বেইজড সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ঃ

▸ উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা/মাঠসহকারীগন মাসিক কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী এ সপ্তাহ পূর্বে নির্দ্ধারিত এলাকায় কর্মসূচী সর্ম্পকে ক্যাম্পেইন বা প্রচার করবেন। নির্দ্ধারিত গ্রামে সেবা ক্যাম্পের মাধ্যমে কৃষক এবং খামারীদের সেবা প্রদান করা হবে। ▸ সম্প্রসারন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সেবাক্যাম্পে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির (ইউপি চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড মেম্বার) উপস্থিত থাকার ব্যবস্থা করা হবে। ▸ সকল সম্প্রসারন কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময় প্রাণিসম্পদ বিভাগের ব্যানার ব্যবহার করা হবে। ▸ প্রত্যেক উপসহকারী/ মাঠসহকারীগন সংশ্লিষ্ট গ্রামে নির্দ্ধারিত ক্যাম্পে সম্প্রসারন কাজের পাশাপাশি উক্ত গ্রামে পারিবারিক প্রাণিসম্পদ পরিসেবা প্রদান করবেন। ▸ পারিবারিক পরিদর্শনের তথ্য দপ্তরের পরামর্শ প্রদান রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

কার্যক্রম ৪.সম্প্রসারণকার্যক্রমের তথ্যসংরক্ষণএবংপ্রতিবেদন প্রেরণ ঃ

▶ সম্প্রসারন কার্যক্রমের সকল তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টারে (প্রমানকসহ) এবং দপ্তরের কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হবে। প্রতিবৃহস্পতিবারে অপরাহ্নে সাপ্তাহিক কার্যক্রমের তথ্য রেজিষ্টারে এবং কম্পিউটারে হালনাগাদ করা হবে। ▶ সম্প্রসারন রেজিষ্টার সমুহ সংশ্লিষ্ট উপসহকারীগন সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করবেন। অফিস সহকারীগন দপ্তরের কম্পিউটারে তথ্যাদি সংরক্ষণ করবেন। ▶ ইউএলওগন প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরনের সময় রেজিষ্টার সমুহ যাচাই করে প্রতি স্বাক্ষর করবেন।

সম্প্রসারণ কার্যক্রমের প্রতিবেদন তৈরী এবং অধিদপ্তরে প্রেরনের জন্য গুগুল বেইজড 'লাইভষ্টক এক্সটেনশান রিপোটিং সফটওয়ার' চালু করা হবে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাগন প্রতিমাসে সম্প্রসারন কার্যক্রমের মাসিক প্রতিবেদন নিদ্ধারিত তারিখে অনলাইনে জেলা দপ্তরে প্রেরন করবেন। কার্যক্রমটি রাজশাহী বিভাগে চালু করা হয়েছে। নির্ভূল ও দ্রুত রিপোর্ট প্রেরনে এটি একটি জরুরী ব্যবস্থা।

অনলাইন রিপোর্টিং সিটেম

কার্যক্রম-৫ সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ

প্রতি মাসের শেষ বৃস্পতিবার উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে ইউএলও এর সভাপতিত্বে মাসিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় দপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগন উপস্থিত থাকবেন। সভায় চলতি মাসের কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ীসম্প্রসারন কার্যক্রমের অগ্রগতি এবং পরবর্তী করনীয় পর্যালোচনা করা হবে। এদিন রেজিষ্টার সমুহ হালনাগাদ এবং পরবর্তী মাসের কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হবে।

লাইভষ্টক ফিল্ড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিসটেম (L-FIM SYSTEM) ঃ

প্রত্যেক উপজেলায় প্রাণিসম্পদ সম্পর্কীত মাঠ তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হবে যা **"লাইভষ্টক ফিল্ড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিসটেম"** নামে পরিচিত হবে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রাণিসম্পদ সম্পর্কীত তথ্য নিয়মিত সংগ্রহ করা হবে। এ প্রক্রিয়ায় প্রতিটি ইউনিয়নে ৩জন করে (প্রতি ওয়ার্ডে ১জন) লাইভষ্টক ইনফরমেশন প্রোভাইডার (LIP) নির্বাচন করা হবে। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে কর্মরত এআই টেকনিশিয়ান, সিল, স্বেচ্ছাসেবী, এলএসপি, সচেতন খামারীদের মধ্য থেকে এলআইপি নির্বাচন করা হবে। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপসহকারীগন তার ইউনিয়নের এলআইপিদের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রাখবেন। এলআইপিরা সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রাণিসম্পদ বিষয়ক উল্লেখযোগ্য তথ্য বিশেষ করে রোগবালাই এবং দুর্ঘটনার তথ্য জানার সাথে সাথে মোবাইলে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে প্রেরন করবে এবং তথ্য রেকর্ড করা হবে। প্রত্যেক উপজেলায় একটি করে "লাইভষ্টক ফিল্ড

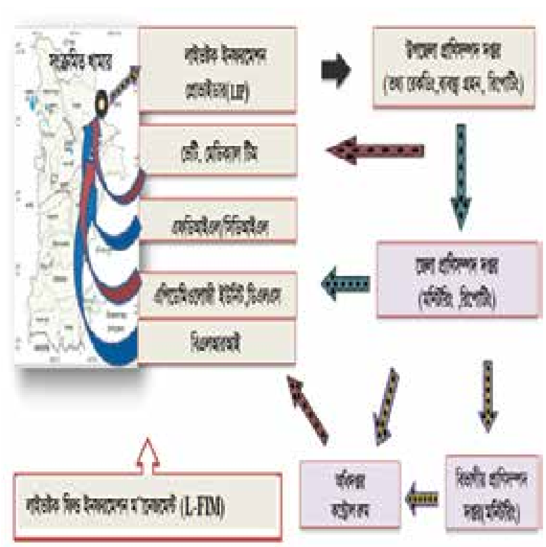

L-FIM SYSTEM

ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট” রেজিষ্টার মেইনটেন করা হবে। এলআইপিদের প্রেরিত তথ্য রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা হবে। তথ্যের ভিত্তিতে ইউএলও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন। প্রয়োজনে উপজেলা ভেটেরিনারি মেডিক্যাল টীম কাজ শুরু করবে। ইউএলও বিষয়টি প্রথমে ডিএলওকে অবহিত করবেন। পরিস্থিতি বিবেচনায় ডিএলও সংশ্লিষ্ট এফডিআইএল, সিডিআইএল/এপিডেমিওলজী ইউনিট বা বিএলআরআই কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনে যোগাযোগ করবেন।

বিভাগীয় উর্দ্ধতন দপ্তরএবং কর্তৃপক্ষের সাথে দৈনন্দিন যোগাযোগ (ED COM SYSTEM) ঃ

সম্প্রসারণ কার্যক্রম সুষ্ঠুবাস্তবায়নে বিভাগীয় উর্দ্ধতন ও অধ:স্তন কর্তৃপক্ষ বা দপ্তরের সাথে প্রতিদিন যোগাযোগ অপরিহার্য। প্রতিদিন এই যোগাযোগের ফলে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপপরিচালক এবং পরিচালক এর মধ্যে সুসমন্বয় বজায় থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাগন মাঠ পর্যায়ের তথ্যাদি সর্ম্পকে প্রতিদিন আপডেট থাকবেন।

উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাগন প্রতিদিন অপরাহ্নে সম্প্রসারন কার্যক্রম, রোগবাইল এর তথ্য এবং দপ্তরের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাকে মোবাইল বা টেলিফোনে অবহিত করবেন। উপজেলায় প্রাণিসম্পদ সম্পর্কীত নোটিসিবেল কোন বিষয় থাকলে সেটি অবশ্যই তাৎক্ষনিক জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাকে জানাতে হবে। একইভাবে জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাগন প্রতিদিন তাঁর জেলার দৈনন্দিন কার্যক্রম সর্ম্পকে বিভাগীয় উপপরিচালককে অবহিত করবেন।

উপপরিচালকগন ও প্রতিদিন তাঁর সকল জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা/দপ্তরের সাথে এবং জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাগন তাঁর জেলার সকল উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা/দপ্তরের সাথে দিনে অন্তত: একবার যোগাযোগ করবেন এবং সার্বিক বিষয়ে খোঁজ খবর নিবেন।

(ED COM SYSTEM)

বিবিধ-১
প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের তথ্য ফরমের নুমনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

প্রশিক্ষণ শিরোনাম : ডিএলএস স্টাফদের পেশাগত উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষন।
প্রশিক্ষণ মেয়াদ : ৫ দিন।
প্রশিক্ষণ ভ্যানু : ....।

প্রশিক্ষণার্থীর তথ্যাবলী

[নিচের ছকটি পূরণ করুন (* চিহ্নিত স্থানটি পূরণ আবশ্যকীয়)]

প্রশিক্ষণার্থীর নাম	বাংলা*	:
	English Block Letter*	:
পিতার নাম	বাংলা*	:
	English Block Letter*	:
মাতার নাম	বাংলা*	:
	English Block Letter*	:
কর্মস্থল	বাংলা *	:
	English Block Letter*	:
পদবী*		:
জাতীয় পরিচয় পত্র নং		:
লিঙ্গ		:
বৈবাহিক অবস্থা		:
জন্ম তারিখ *		:
জাতীয়তা *		:
ভাষাগত দক্ষতা*	বাংলা	:
	ইংরেজি	:
	অন্যান্য	:
ধর্ম*		:
স্বাস্থ্যগত অবস্থা		:
রক্তের গ্রুপ		:

শিক্ষাগত যোগ্যতা*	ডিগ্রি/সার্টিফিকেট	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়	পাশের সাল	জিপিএ/বিভাগ

স্থায়ী ঠিকানা*	:
বর্তমান ঠিকানা	:
ইতিপূর্বে কোন কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন উল্লেখ করুন*	:
*ইমেইল/ফেসবুক/টুইটার/অন্যান্য সোস্যাল মিডিয়ার ঠিকানা (যদি থাকে)	:
টেলিফোন/মোবাইল নম্বর*	:
জরুরী যোগাযোগ *	:
অন্যান্য তথ্য	:

তারিখ প্রশিক্ষণার্থীর স্বাক্ষর

বিবিধ-২
প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত ও পর্যালোচনা ছক

প্রশিক্ষনার্থীরা নীচে তাদের মতামত লিখবেন এবং প্রশিক্ষণ সহায়তাকারীকে ফেরত দেবেন। প্রয়োজনে আলাদা কাগজ ব্যবহার করুন।

ক্রমিক নং	বিষয়	মতামত	মন্তব্য (মতামত ব্যাখ্যা করুন)
১.	এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের আগে আপনি কি কম্পিউটার ব্যবহার করেছেন?	হ্যাঁ / না	
২.	এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য জানেন কি?	হ্যাঁ / না	
৩.	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যের সঙ্গে এর বিষয়বস্তু সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করেন কি?	০-২০% ১ ২১-৪০% ২ ৪১-৬০% ৩ ৬১-৮০% ৪ ৮১-১০০% ৫	
৪.	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য কতটুকু সফল হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?	০-২০% ১ ২১-৪০% ২ ৪১-৬০% ৩ ৬১-৮০% ৪ ৮১-১০০% ৫	
৫.	আপনার কর্মপরিধির কতটুকু প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত?	০-২০% ১ ২১-৪০% ২ ৪১-৬০% ৩ ৬১-৮০% ৪ ৮১-১০০% ৫	
৬.	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি কতটুকু গ্রহণযোগ্য বলে আপনি মনে করেন?	০-২০% ১ ২১-৪০% ২ ৪১-৬০% ৩ ৬১-৮০% ৪ ৮১-১০০% ৫	
৭.	এই প্রশিক্ষণের তিনটি সন্তোষজনক দিক উল্লেখ করুন।	১. ২. ৩.	
৮.	এই প্রশিক্ষণের তিনটি অসন্তোষজনক দিক (যদি থাকে) উল্লেখ করুন।	১. ২. ৩.	
৯.	এই প্রশিক্ষণ চলাকালে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাসের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয়েছে কি? হ্যাঁ হলে সমস্যার ধরণ ঃ	১. ২. ৩.	
১০.	এই প্রশিক্ষণের উন্নয়নে আপনার তিনটি সুপারিশ লিখুন।	১. ২. ৩.	

বিবিধ-৩

পরিভাষা (Terminology)

প্রাণিসম্পদ পরিভাষা (Livestock Terminology)ঃ

রুমিনেন্ট (Ruminant) ঃ রুমিনেন্ট শব্দটি ল্যাটিন শব্দ রুমিনার থেকে এসেছে যার অর্থ পুনরায় চিবানো। রুমিনেন্ট হলো চতুষ্পদ স্তন্যপায়ী প্রাণি যারা হজমের আগে পেটের খাবার পুনরায় চিবিয়ে পুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হয়।

গরু (Cattle) : স্ত্রী-পুরুষ উভয় লিঙ্গের গো-জাতিকে বুঝায়।

ষাঁড় (Bull) : প্রজননক্ষম পুরুষ গরু কে বুঝায়।

গাভী (Cow) : অন্তত একবার বাচ্চা প্রসবকারী স্ত্রী গরুকে বুঝায়।

বলদ (Bullock) : প্রজনন ক্ষমতা রহিত করা বা খোঁজা করণকৃত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ গরুকে বুঝায়।

বকনা (Heifer) : প্রথম বাচ্চা জন্ম দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের স্ত্রী গরুকে বুঝায়।

বাছুর (Calf) : স্ত্রী/পুরুষ উভয় বাচ্চা গরুকে বুঝায়।

বকনাবাছুর (Heifer Calf) :১ বছরের কম বয়সী স্ত্রী গরুকে বুঝায়।

এঁড়েবাছুর (Bull Calf) : ১ বছরের কম বয়সী পুরুষ গরুকে বুঝায়।

স্টাডষাঁড় (Stud bull) : প্রজননে জন্য রক্ষিত প্রাপ্ত বয়স্ক ষাঁড়।

গো-পাল (Cattle Herd) : এক সাথে অনেক গরু চড়লে বা পালন করা হলে তাকে গো-পালবলাহয়।

বীফ (Beef) : গরুর মাংসকে বীফ বলে।

মহিষ (Buffalo) : স্ত্রী-পুরুষ উভয় মহিষকে বুঝায়।

ছাগল (Goat) : স্ত্রী-পুরুষ উভয় ছাগলকে বুঝায়।

পাঁঠা (Buck) : পূর্ণবয়স্ক প্রজননক্ষম পুরুষ ছাগলকে বুঝায়।

ছাগী (Doe) : অন্তত একবার বাচ্চা প্রসবকারী স্ত্রী ছাগলকে বুঝায়।

বাকলিং (Buckling) : অপ্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ছাগলকে বুঝায়।

গোটলি (Goatling) : অপ্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী ছাগলকেবুঝায়।

ছাগলছানা (kid) : স্ত্রী-পুরুষ উভয় ছাগল ছানাকে বুঝায়।

খাসী (Castrated Goat) : প্রজনন শক্তি রহিত বা খোজাঁ করণকৃত পুরুষ ছাগলকে বুঝায়।

গোট ফ্লক (Goat flock) : ছাগলের পালকে গোট ফ্লক বলে।

চেভন (Chevon) : ছাগলের মাংসকে চেভন বলে।

মেষ (Sheep) : স্ত্রী-পুরুষ উভয় ভেড়াকে বুঝায়।

ভেড়া (Ram) : পূর্ণবয়স্ক প্রজননক্ষম পুরুষ মেষকে বুঝায়।

ভেড়ী (Ewe) : অন্তত একবার বাচ্চা প্রসবকারী পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রী মেষকে বুঝায়।

মেষশাবক (Lamb) : ৬ মাসের নীচে স্ত্রী-পুরুষ উভয় মেষের বাচ্চাকে বুঝায়।

ভেড়াশাবক (Ram lamb) : ৬ মাসের নীচে ভেড়ার পুরুষ বাচ্চাকে বুঝায়।

ভেড়ী শাবক (Ewe lamb) : ৬ মাসের নীচে ভেড়ীর স্ত্রী বাচ্চাকে বুঝায়।

ওয়েদার (Weather) : খাসী করা ভেড়াকে বুঝায়।

মেষপাল (Sheep Flock) : এক সাথে অনেকগুলো মেষ থাকা বা চড়াকে বুঝায়।

মাটন (Mutton) : ভেড়ার মাংসকে মাটন বলা হয়।

পোল্ট্রি পরিভাষা (PoultryTerminolagy) ঃ

পোল্ট্রি (Poultry) ঃ সকল বয়সের হাঁস-মুরগি, কবুতর এবং অন্যান্য পাখি যাদের অর্থনৈতিক উদ্দ্যেশে পালন করা হয়।

পাখি (Bird) ঃ পক্ষিকুলের যেকোনো জাতকে পাখি বা বার্ড বলা হয়।

জাত (Breed) ঃ পোল্ট্রির দল যাদের বাহ্যিক ও কৌলিক গুণাগুণ তাদের প্রজন্ম পুন:উৎপাদনে প্রতিফলিত হয়।

ভ্যারাইটি (Variety) ঃ একই জাতের মধ্যে পালকের রং,ঝুঁটির আকার বা পৃথক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে ভ্যারাইটি নির্বাচন করা হয়।

স্ট্রেইন (Strain) ঃ কোনো একক প্রজননকারী কর্তৃক কমপক্ষে পাঁচ বংশ পরম্পরায় প্রজননের মাধ্যম সৃষ্ট নির্দিষ্ট নামধারী পোল্ট্রির অধিনস্থ উপজাতকে স্ট্রেইন বা বিশেষ উপজাত বলে।

ফ্লক (Flock) ঃ একই বয়সের একই উদ্দেশ্য পালন করা একটি গ্রুপের হাঁস-মুরগিকে বুঝায়।

ব্রুডিং (Brooding) ঃ ডিম ফোটার পর হাঁস-মুরগির বাচ্চাকে তাপ দেয়া বুঝায়।

ব্রুডার (Brooder) ঃ হাঁস-মুরগির বাচ্চা তাপ দেয়ার যন্ত্রকে বুঝায়।

হ্যাচিং (Hatching) ঃ ডিম ফুটানোকে বুঝায়।

চিক (Chick) ঃ মুরগির বাচ্চাকে বুঝায়।

বেবীচিক (Baby chick) ঃ মুরগির নবজাতক ছানাকে বুঝায়।

কম্ব (Comb) ঃ মুরগির মাথার ঝুঁটিকে বুঝায়।

ওয়াটল (Wattle) ঃ মুরগির গলকম্ব কে বুঝায়।

ডে-অল্ডচিক (Day old chick) ঃ ১ দিনের বয়সের মুরগির বাচ্চাকে বুঝায়।

গ্রোয়ার (Grower) ঃ হাঁস-মুরগির ব্রুডিং- এরপরে থেকে প্রজনন উপযোগী পর্যন্ত বয়সকে বুঝায়।

পুলেট (Pullet) ঃ ডিম পাড়ার উপযোগী স্ত্রী মুরগিকে বুঝায়।

মুরগী/হেন (Hen) ঃ ডিমপাড়া মুরগিকে বুঝায়।

ককরেল (Cockrell) ঃ প্রজননক্ষম হওয়ার পূর্ব বয়স পর্যন্ত পুরুষ মুরগিকে বুঝায়।

কক (Cock) ঃ প্রজনন উপযোগী পুরুষ মুরগিকে বুঝায়।

কেপন (Capon) ঃ অস্ত্রোপাচারের মাধ্যমে অন্ডকোষ অপসারন করা মোরগকে বুঝায়।

লেয়ার (Layer) ঃ ডিমপাড়া হাঁস-মুরগীকে বুঝায়।

ব্রয়লার (Broiler) ঃ ৬-৮ সপ্তাহ বয়সের মাংসালো জাতের হাইব্রিড মুরগি যার ওজন প্রায় ২-২.৫ কেজি হয়ে থাকে এবং মাংস নরম ও সুস্বাদু।

ব্রয়লার স্টারটার রেশন- অল্পবয়স্ক ব্রয়লার মুরগির খাদ্যকে বুঝায়।

ব্রয়লার ফিনিসার রেশন- ৩-৪ সপ্তাহ বয়স থেকে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত ব্রয়লার মুরগির খাদ্যকে বুঝায়।

রোস্টার (Roaster) ঃ এক বছর বয়সের উপরের মোরগকে বুঝায়।

ডাক (Duck) ঃ স্ত্রী-পুরুষউভয় জাতের হাঁসকে বুঝায়।

ড্রাক (Drake) ঃ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ হাঁসকে বুঝায়।

গ্যান্ডার (Gander) ঃ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ রাজহাঁসকে বুঝায়।

গুজ (Goose) ঃ প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী রাজহাঁসকে বুঝায়।

কবুতর (Peigon) ঃ কবুতর বলতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়জাতের কবুতরকে বুঝায়।

স্কোয়াব (Squab) ঃ পাখা গজায়নি বা উড়তে শিখেনি এমন কবুতর ছানাকে বুঝায়।

ক্যাপোনাইজেশন (Caponization) ঃ মোরগ খোঁজাকরণের পদ্ধতিকে বুঝায়।

মোল্টিং (Moulting) ঃ হাঁস-মুরগির পুরাতন পালক খসে নতুন পালক গজানোকে বুঝায়।

ফিডার (Feeder) ঃ হাঁস-মুরগির খাদ্য পাত্র;

ড্রিংকার (Drinker) ঃ হাঁস-মুরগির পানির পাত্র;

লিটার (Liter) ঃ কাঠের গুড়া, তুস বা খড়েরটু করা দ্বারা তৈরি হাঁস-মুরগির ঘরে বিছানাকে বুঝায়।

ফুটবাথ (Foot Bath) ঃ খামারে প্রবেশ পথে জীবাণুনাশক মিশ্রিত পানির ট্রে বা চৌবাচ্চাকে বুঝায়।

বায়োসিকিউরিটি (Bio Security) ঃ খামারের জীব নিরাপত্তাকে বুঝায়।

কেন্ডেলিং (Candleling) ঃ আলোর মাধ্যমে ডিম পরীক্ষা করাকে বুঝায়।

নিষিক্তডিম (Fertile Egg) ঃ বাচ্চা ফুটানোর উপযোগী ডিমকে বুঝায়।

হ্যাচারী (Hatchery) ঃ যেখানে ডিম ফুটানো হয় যন্ত্রপাতিসহ সেই স্থান বা বিল্ডিংকে বুঝায়।

ইনকুবেটর (Incubator) ঃ ডিম ফুটানো মেশিনকে বুঝায়।

ফিউমিগেশন (Fumigation) ঃ রাসায়নিক ব্যবহারে ধুঁয়া সৃষ্টির মাধ্যমে জীবাণু-মুক্তকরণকে বুঝায়।

অল-ইন-অল-আউট (All in-all out) ঃ এক সঙ্গে একই বয়সের মুরগি খামারে প্রবেশ এবং একই সাথে বিক্রির উদ্দ্যেশে খামার থেকে বের করাকে বুঝায়।

আইসোলেশন (Isolation) ঃ পশু-পাখিকে রোগ নির্নয় বা চিকিৎসার জন্য আলাদা করে রাখার ব্যবস্থাকে বুঝায়।

কালিং (Culling) ঃ পাল থেকে অপ্রয়োজনীয় পশু-পাখি ছাঁটাই করাকে বুঝায়।

ডিজইনফেকশন (Disinfection) ঃ জীবাণু-মুক্তকরণ ব্যবস্থাকে বুঝায়।

বিবিধ-৪

Acronyms

Abbreviation	Full Name	Abbreviation	Full Name
AG	Agri Business	PPP	Public Private Partnerships
BSTI	Bangladesh Standard and Testing Institute	PPR	Public Procurement Rule
CSA	Climatic Smart Agriculture	PPR	Pesti des Petits Ruminant
CTC	Chief Technical Coordinator	PPs	Project Proposals
DH	Dairy Hubs	PO	Producer Organization
DPP	Development Project Proposal	PG	Producer Group
DDB	Dairy Development Board	PPE	Personal Protection Equipment's
BDRI	Bangladesh Dairy Reaserch Institute	PEC	Project Evaluation Committee
BPRI	Bangladesh Poultry Reaserch Institute	TA	Technical Assistance
TMR	Total Mixed Ration	TOR	Terms of Reference
PMU	Project Management Unit	USAID	United State Agencies for International Development
PIU	Project Implementation Unit	WB	World Bank
SME	Small & Medium Enterprises	VC	Value Chain
VMCC	Village Milk Collection Centre	MDG	Millennium Development Goal
FFS	Farmers Field School	LDDP	Livestock and Dairy Development Project
FOs	Farmer Organizations	MG	Matching Grant
FYP	Fifth Five year Plan	MGS	Matching Grant Scheme
FCR	Feed Conversion Ratio	MoU	Memorandum of Understanding
GHG	Green House Gas	MOFL	Ministry Osf Fisheries and Livestock
HH	House Hold	NDDB	National Dairy Development Board
HACCAP	Hazard Analysis and Critical Control Point	FG	Farmers Group
MVC	Mobile Veterinary Clinic	OIE	Office of the International Epizootic (World Organization for Animal Health)
LFA	Livestock Field Assistant	UMS	Urea Molasses Staw
LSP	Local Service Provider	UMB	Urea Molasses Block
IMED	Implementation Monitoring Evaluation Division	SDG	Sustainable Development Goal
LIPP	Livestock Insurance Pilot Program	UN	United Nation
HRM	Humane Resource Management	HRD	Human Resource Development

বিবিধ-৫

রেফারেন্স সমূহঃ

১. Handbook of Veterinary Pharmacology-Walter H. Hsu.
২. Veterinary Pharmocology and Therapeutics (Tenth Edition)-Jim E. Riviere, Mark G.Papich.
৩. Casarett and Doull's Toxicology the Basic Science of Poisons (Sixth Edition)-Curtis D. Klaassen.
৪. Veterinary Toxicology-Radhey Mohan Tiwari, Malini Sinha.
৫. The Vets' Solution (3rd edition)- Asst. Prof. Dr. Raihana Nasrin Ferdousy Sharmin.
৬. প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (এলআরআই), মহাখালী, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত রোগ প্রতিরোধ টীকা বুকলেট।
৭. স্কুল অব এগ্রিকালচার এন্ডা রুরাল ডেভেলপমেন্ট, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
৮. প্রশিক্ষণ হ্যান্ডআউট, বিএলআরআই।
৯. ফার্মাকোলজি এন্ড টক্সিকোলজি, ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি স্থাপন প্রকল্প।
১০. ব্রয়লার পালন ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ মডিউল, ড. মো. গোলাম রব্বানী।
১১. আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ মাঠ পর্যায়ে সুফলভোগী খামারীর প্রশিক্ষণ মডিউল, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
১২. মহিষ পালন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
১৩. প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা এবং বাস্তবায়ন কৌশল, ডা. মো: সালেহউদ্দিন খান, এনএটিপি-২।
১৪. সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
১৫. ন্যাশনাল লাইভস্টক ট্রেনিং ইন্সটিটিউট উদ্যোক্তা উন্নয়ন মডিউল।
১৬. সোনালী মুরগির প্যারেন্ট স্টক পালন ম্যানুয়েল, মোঃ শাহ জামাল।
১৭. স্মার্ট লাইভস্টক এক্সটেনশন সার্ভিস "বিভাগীয় প্রাণি সম্পদ রাজশাহী"।